সংকল্প

– এমডিএস রুবেল জিয়ান

সে হঠাৎ ফোন করে বললো, ঢাকার বাইরে যাচ্ছে।

তাকে কালো শাড়িতে, পহেলা বৈশাখে দেখার ইচ্ছা প্রবলভাবে বোঝালাম। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝলো না। আমার দুঃখটা হৃদয়ে রয়েই গেল। লজ্জারাঙা প্রিয়া বলেছিল, শাড়ি পরে সে কখনো আমার সামনে আসবে না। কারণ দুটি! প্রথমত. লজ্জা, দ্বিতীয়ত. শাড়ি পরে নাকি সে হাটতে পারে না।

আমি মনে করি, লজ্জা এবং শাড়ি পরে হাটতে না পারাটা মেয়েদের বড় ব্যর্থতা। কারণ শাড়ি হচ্ছে বাঙালি ললনাদের ঐতিহ্য।

সেদিন বৈশাখে সুপ্তিকে প্রিয় কালো শাড়িতে না পেয়ে হৃদয়ে শুধু কল্পনার প্রাসাদ গড়েছি।

আসলে সে শাড়ি পরতে জানে। হয়তো পারিবারিক কোনো সমস্যা ছিল। কারণ রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে তো! তবে আমার যে ইচ্ছা তা কখনো ব্যর্থ হবে না। পুরুষের ইচ্ছার কখনো সমাধি হয় না। কালো শাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাকে দেখার ইচ্ছাটা পূরণ করবোই।

পান্থপথ, ঢাকা থেকে

লোভনীয়

সবেমাত্র মাস্টার্স শেষ করেছি। হাতে অফুরন্ত সময়। ভেবেছিলাম বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে ঘুরে আড্ডা মেরে আর অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে অবসরটা কাটাবো। কিন্তু শিল্পপতি মামার জন্য তা পারিনি। তার বিশেষ অনুরোধ এবং মা–বাবার আদেশে একটি মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির চাকরিতে যোগ দিতে হলো।

প্রথম দিন অফিসে গিয়েই বুঝলাম, প্রতিটি কর্মকর্তা–কর্মচারী আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সকলের বোবা দৃষ্টির ভাষা একই। এ ভাষা আমার কাছে নতুন নয়, বহু পরিচিত। যতোই দিন যাচ্ছিল ততোই বুঝলাম, অফিসের সবাই আমার পেছনে অযথা ঘুর ঘুর করে। নানান অজুহাতে ওরা আমার কাছাকাছি থাকতে চায়। কারো সঙ্গে একটু হাসা, একটু কথা বলা যেন ওদের বিশাল প্রাপ্তি। মনে হচ্ছে আমি বললে, আমাকে আকাশ থেকে চাদও ওরা এনে দেবে।

আসলে আমি দেখতে মোটামুটি সুন্দরী। ফিগারটাও চমৎকার। ফ্যাশন সচেতন। চলনে–বলনে স্মার্ট ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করি। তাই বন্ধু মহলের সকলেই, আমার ফান প্রিয় বন্ধু সোহেলের ভাষায়, আমি হলাম পৃথিবীর অন্যতম সুন্দরী। ইতিমধ্যে আমিও তা বুঝেছি। কারণ রাস্তায় বের হলে সবাই কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। কোথাও গেলে না দেখেও বুঝতে পারি, সকলের চোখ আমাকেই দেখছে।

রূপালি চাদকে সবাই ছুতে চায়। কিন্তু ছুতে না পারার ব্যর্থতায় তাদের মনে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত আবেগ আর ভালোবাসা। আমাকেও সবাই ছুতে চায় কিন্তু পারে না। তাই গভীর আবেগ ভরা দৃষ্টিতে তারা আমাকে দেখে। তাদের এ চোখের ভাষায় পুলকিত হই, রোমাঞ্চিত হই। গর্ব আর অহঙ্কারে

আমার মন ভরে ওঠে। তাই নিজেকে আরো আকর্ষণীয়, আরো লোভনীয়ভাবে গড়ার প্রতিযোগিতায় দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করি।

যা হোক, এরই মাঝে আমার জন্মদিন চলে এলো। সোহেলকে নিয়ে সারা দিন ঘুরলাম। বেইলি রোডের একটা দোকান থেকে ও আমাকে একটা শাড়ি কিনে দিল। বিদায়ের সময়ে গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে চুমু দিয়ে বললো, এই নীল শাড়িতে তোমাকে অপূর্ব সুন্দর দেখাবে। ভাবছি এ শাড়ি পরে বাইরে বের হলে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম না হয়।

না সেদিন বাস্তায় কোনো ট্রাফিক জ্যাম পড়েনি, তবে আমার জীবন চলার পথে সেই থেকে এক দীর্ঘস্থায়ী জ্যামের সৃষ্টি হয়েছিল। একটা শাড়ি আমার স্বাধীন বিহঙ্গের মতো জীবনটাকে বদলে দিল। এতোদিন ধরে তিলে তিলে গড়া, উচ্ছলতা আর চঞ্চলতায় ভরা আমার এ জীবনের স্বপ্নগুলোকে ভেঙে দিল।

সোহেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল, পরের দিন এই নতুন শাড়ি পরে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবো। ঠিক করলাম, প্রথমে অফিসে যাবো, লাঞ্চ টাইমে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে যাবো। দুজনে চায়নিজ খাবো, এদিক–ওদিক বেড়াবো, সন্ধ্যায় মহিলা সমিটিতে নাটক দেখে বাসায় ফিরবো।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কাজ সেরে নিজেকে সাজাতে শুরু করলাম। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে সাজলাম। চুলে ব্রাশ করে খোপা বাধলাম। আয়নায় নিজেকে দেখলাম। কিন্তু নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আমি নিজেই মুগ্ধ হলাম, আমার সৌন্দর্যে। নিজেই শিহরিত হলাম, গর্ব আর অহঙ্কারে আমার মন ভরে উঠলো। একটা শাড়ি যে একজন নারীকে এতোটা সুন্দরী করতে পারে এর আগে তা আমার জানা ছিল না। সুন্দর শাড়ি উপহার দেয়ার জন্য মনে মনে সোহেলকে ধন্যবাদ জানালাম।

অফিসের গাড়িতেই অফিসে এলাম। গেট দিয়ে ঢুকতেই লক্ষ্য করলাম, দারোয়ান সালাম করতে গিয়েও হাত অর্ধেক উঠে থেমে গেছে। মুখ হা করে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্পষ্ট তাকে ঢোক গিলতে দেখলাম।

অফিস রুমে গিয়ে বসলাম, লাঞ্চ টাইমে ছুটি নিয়ে যাবো। তাই হাতের কাজগুলো দ্রুত শেষ করতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারছিলাম না, সহকর্মীরা কিছুক্ষণ পর পর অযথা এসে বিরক্ত করছিল। হঠাৎ অফিসের এমডি আমার রুমে এসে চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ আমার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, অপূর্ব! খুব সুন্দর লাগছে আজ আপনাকে, এতোদিনে শাড়িটা নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত স্থান খুজে পেয়েছে।

লাজুক হেসে বললাম, থ্যাংক ইউ স্যার।

তিনি চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর পিয়ন এসে জানালো, অফিস থেকে যাবার আগে এমডি স্যার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

লাঞ্চ টাইমে ছুটির কথা এমডি–কে আগেই জানিয়েছিলাম। তাই অফিস থেকে বের হবার আগে তার রুমে গেলাম। লক্ষ্য করলাম তিনি চেয়ারে বসে নেই। পাশের সোফায় আরাম করে বসেছেন। আমাকে দেখে তার পাশের আসনে বসতে আহ্বান জানালেন। ইতস্তত করে সেখানে বসলাম। এটা

ফাইল হাতে নিয়ে তিনি আমার আরো কাছে সরে এলেন। ফাইলটা খুলে কতোকগুলো কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, আমি হাত বাড়াতেই আস্তে করে আমার হাতটা ধরলেন।

কিছুটা অবাক হলাম। তার চোখের দিকে তাকালাম। চোখে রহস্য। ঘোর লাগানো। ভালোলাগা এক অদ্ভুত দৃষ্টি দেখলাম। দুই চোখে যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণ। শত চেষ্টা করেও তার চোখের দৃষ্টি থেকে আমার চোখ ফেরাতে পারিনি। কি এক সম্মোহনে ভরা ওই চোখ দুটো আমার চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিল। অপলকভাবে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন, আমার শরীরের সঙ্গে তার শরীরের স্পর্শ পেলাম, আমার মুখের কাছে তার মুখ আনলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, ধীরে ধীরে আমাকে তার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

হঠাৎ চেতনা ফিরে পেলাম। এক ঝটকায় তাকে দূরে ঠেলে উঠে দাড়ালাম। কিন্তু লোহার মতো একটা শক্ত হাত আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরলো, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। বরং তার এক টানে সোফায় লুটিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে পাষণ্ডটা আমার শরীরের ওপর উঠে পড়লো। আমি মুক্তির জন্য হাত–পা ছুড়লাম। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। মুখে অনর্গল গালি দিতে থাকলাম। একটা হাত দিয়ে পশুটা আমার মুখ চেপে ধরলো। অন্য হাত দিয়ে আমার উর্ধাঙ্গ থেকে আবারণ সরিয়ে নিল। টের পেলাম, লোহার মতো একটা হাত আমার বুকের নরম মাংসপিণ্ড দুটোকে থেতলে দিচ্ছে।

অথচ কিছুই করতে পারছিলাম না। পশুটার প্রচণ্ড শক্তির কাছে আমি অনড়। আমার শরীর কাপতে লাগলো। চোখ ফেটে বাধভাঙা কান্না বের হলো। সেই সঙ্গে টের পাচ্ছিলাম, পা থেকে শাড়ি আর পেটিকোট টেনে তোলা হচ্ছে। দেখলাম, পশুটা তার প্যান্টের জিপারে হাত দিয়েছে।

আমার জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, ভাবতে মাথাটা দুলে উঠলো। প্রচণ্ড আক্রোশে মাথাটাকে উপরে তুললাম। তার মুখমণ্ডল কাছে পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার ডান গালে একটা জোরালো কামড় বসালাম। একটা অস্ফুট চিৎকার দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে তার ক্ষত স্থান চেপে ধরলো। দ্রুত সোফা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়লাম। এক লাফে বাইরে বের হওয়ার দরজার কাছে ছুটে গেলাম, শাড়িটা পরা শুরু করলাম।

শুনতে পেলাম, ফোপাতে ফোপাতে পশুটা বলছে, নীল শাড়িতে তোমাকে এতো লোভনীয় লাগছিল যে, কিছুতেই আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি। তুমি ঠিক কাজ করেছো। আমাকে শাস্তি দাও, আরো শাস্তি দাও। আমার মতো এ পশুর মানুষের সমাজে বাচার কোনো অধিকার নেই।

প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগ নিয়ে আমি বাসায় ফিরে এলাম। সোহেলকে ফোনে শরীর খারাপের কথা জানালাম, পরদিন থেকে আর অফিসে যাইনি।

দুই বছর পর সোহেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু কখনো নীল শাড়ি পরিনি। আগের মতো এখন আর সাজতেও চেষ্টা করি না। প্রথম প্রথম সোহেল আমাকে সাজতে বলতো। আমি হাসি মুখে ওকে বলেছি, তোমাকে তো আমি চিরদিনের জন্য একান্ত আপন করে পেয়েছি। তোমাকে হারানোর আমার কোনো ভয় নেই। সুতরাং সাজারও দরকার নেই। সোহেল আমার কথা শুনে খুব খুশি হয়। হয়তো গর্বে ওর মন ভরে উঠে।

কিন্তু আমার মনের মাঝে যে তীব্র যন্ত্রণার আগুন জ্বলছে তা কি কখনো সোহেল জানবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

শরণখোলা, বাগেরহাট থেকে

নদী ও নারী

– সায়েম সুমন

২০০০ সাল। ডিগ্রি পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য দাদিকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। তখন বরিশালের এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে লঞ্চ ছিল একটি। বর্ষাকাল। নদীর পানি উত্তাল। তবুও যেতে হবে। আসরের সময় ঢাকাগামী *এমভি নাসরিন* নামের লঞ্চটি স্টেশনে পৌছালে লঞ্চে উঠলাম। কিন্তু লঞ্চে উঠতেই চোখ চড়কগাছ। একটুও বসার জায়গা নেই। এতো বর্ষার মধ্যে কেন যে এতো লোক ঢাকা যায় ভেবে পেলাম না। পরে একজন আনসারের সহযোগিতায় দুইজনের শোয়ার মতো একটু জায়গা পেলাম।

দাদি বৃদ্ধ মানুষ। উঠেই নামাজ পড়লেন। আমি এই ফাকে লঞ্চের সামনের দিকটায় চলে গেলাম। তখনো প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে পাশের গ্রামগুলো ভিজছে। ছোট ছোট নৌকাগুলো পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। দিনের শেষ প্রান্তে এসব দৃশ্য দেখতে খুবই ভালো লাগছে।

এরই মধ্যে পরের স্টেশনে পৌছে গেল। নদীর ভাঙন মুখে কয়েকটি মাত্র দোকান। টিন ও খড়ের চালে বৃষ্টি থেকে ঠাই গুজে আছে ঢাকার যাত্রীরা। লঞ্চ ভিড়তেই প্রায় শখানেক লোক উঠতে শুরু করলো বৃষ্টিতে ভিজেই।

হঠাৎ আমার চোখ চলে গেল স্টেশন থেকে একটু দূরে দাড়ানো মধ্য বয়সী একজন লোক ও তার সঙ্গে নীল শাড়ি পরা মেয়েটির ওপর। ভেজা শাড়িতে তার শরীরের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। মনে মনে বললাম, ইশ! শাড়িটা যদি সেই আমলের মসলিন হতো...।

এক পর্যায়ে তারা লঞ্চে উঠলো। কিন্তু সিট খুজে পেল না। এক মন চালে দুটো পাথর থাকলে খুজে পাওয়া যায়। কিন্তু এতো বড় লঞ্চে একজন লোকের বসার স্থান পাওয়া যায় না। মধ্য বয়সী লোকটি খুজতে খুজতে কোথাও না পেয়ে আমার কাছে এসে বললো, বাবা, সমস্ত লঞ্চ তন্নতন্ন করে খুজলাম। কোথাও একটু জায়গা পেলাম না। তুমি যদি দয়া করে একটু...।

ভাবলাম, মেঘ না চাইতেই জল। যাক, গল্প করেই সময়টা কাটানো যাবে। আমার পাশ থেকে বড় ব্যাগটি মাথার কাছে রেখে তাদের বেডশিট পেতে বসতে দিলাম। লোকটি রাজ্য জয়ের মতো তৃপ্তির হাসি দিয়ে বললো, মাসুমা বস।

ঢাকার কোথায় থাকো তুমি?

মহাখালি।

কোথা থেকে উঠেছো?

শিয়ালঘূর্ণী।

তারপর তিনি সব বলতে লাগলেন। ঢাকার টঙ্গীতে সাবান ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। সঙ্গে তার মেয়ে। বয়স পনেরো ষোল হবে। বছর খানেক হলো বিয়ে দিয়েছেন। স্বামী জাতীয় ইউনিভর্সিটিতে চাকরি করে। সেখানে বাসা নিয়েছে। তাই মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে।

এতোক্ষণে মেয়েটির দিকে তাকালাম। পৃথিবীতে সুন্দর বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তার সবই যেন একমাত্র অধিকারিণী সে।

নীল শাড়িতে তাকে এতো সুন্দর লাগছে কেন তা বলতে পারবো না। তার পিতার কথায় বাস্তবে ফিরে এলাম। মাসুমা, তুই বস, আমি একটু পান–বিড়ি খেয়ে আসি।

এক পর্যায়ে মেয়েটিকে বললাম, তোমার নামটা যেন কি?

মাসুমা।

বাড়ি কোন গ্রামে?

জিড়াইল।

তার সঙ্গে কথা বলতে দেখে পাশের লোকগুলো কেমন যেন আড়চোখে তাকাচ্ছিল। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও চিন্তিত হইনি। সে আমাকে প্রশ্ন করলো, ঢাকায় কি করেন?

লেখাপড়া।

কোন ক্লাসে পড়েন।

একটু লজ্জা পেলাম। তবু ভাবলাম, গ্রামের সহজ সরল মেয়ে। তাই উত্তর দিলাম বিএ পরীক্ষা দিয়েছি।

এরই মধ্যে লঞ্চ আরো দ্রুত চলতে লাগলো। চারদিক অন্ধকার। লঞ্চের ভেতরে লাইটগুলো জ্বলে উঠলো।

বৃষ্টি তখন কিছুটা থেমেছে। লঞ্চের সামনের দিকের রঙিন টিভিটায় বাংলা ছবি চলছে। লঞ্চের শব্দে টিভির শব্দ শোনা না গেলেও ছবি দেখা যাচ্ছিল।

সবার দৃষ্টি টিভির ওপর স্থির। মেয়েটির সঙ্গে আমার দুই একটি কথা বিনিময় হয়। আমি যাযাদির রিস্টওয়াচ সংখ্যা বের করলাম।

জায়গা এতোই কম যে, তার আর আমার মাঝে তিন ইঞ্চি গ্যাপ রাখা কষ্টকর। তার শরীরের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে। তাই সে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। বললাম, তুমি ঠিক হয়ে বসো।

সমস্যা নেই।

তোমার স্বামী কি করে?

জাতীয় ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করেন।

তুমি কতোদূর লেখাপড়া করেছো?

ক্লাস এইটে থাকতে বিয়ে হয়। এখন নাইনে থাকতাম।

তুমি এতো সকালে বিয়ে করলে কেন? অবাঞ্ছিত প্রশ্নে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে হাসি দিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার আব্বা এলেন। হালকা কথাবার্তা বলার পর শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর নাক ডেকে ঘুমুতে লাগলেন।

বাংলা ছবি চলছে। মেদসর্বস্ব নায়িকা ও নায়ক অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজে নাচছে। কখনো নায়িকার ভারী শরীর নায়কের বুকের ওপর, কখনো মুখের ওপর। মাসুমা যেন লজ্জা পেল। সে এদিকে মুখ আনতেই আমার মনে দুষ্ট বুদ্ধি এসে গেল। চুপে চুপে ডান হাতটি তার চিবুকে রাখলাম। এবং আস্তে করে চাপ দিলাম। সে কোনো প্রতিবাদ না করে আবার টিভির দিকে তাকালো। এবার আমার হাত তার পিঠের ওপর বিচরণ করলো। সবার দৃষ্টি টিভিতে স্থির। সে শুধু চুপি চুপি বললো, এখন নয়, সবাই দেখবে।

কিন্তু আমি যেন আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এক সময় ছবি বন্ধ হলো। যাত্রীদের প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু আমি আর সে জেগে আছি।

রাত সাড়ে এগারোটার মতো হবে। সে আমার দিকে মুখ করে শুয়ে চোখ বুজে থাকলো। আমি তার ওপরের অঙ্গ থেকে শাড়ি, ব্লাউজ ব্রা–র হুক খুলে নিজেকে ব্যস্ত রাখলাম। এভাবে যে কতোক্ষণ কেটে গেল তা বলতে পারবো না।

ঠিক তখনি বিপত্তিটা ঘটলো। ঢাকা থেকে ভোলাগামী *এম.এল জাহাঙ্গীর* লঞ্চের সঙ্গে আমাদের লঞ্চটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চিৎকার করে জেগে উঠলো। লঞ্চের নিচতলার এক ধার ভেঙে গেছে। তাই লঞ্চ অনেকটা কাত হয়ে গেছে। সব যাত্রীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। কেউ কেউ পানিতে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। দাদিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। নিচতলায় চিৎকার ও কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।

সবাই জামা–কাপড় খুলে অর্ধ উলঙ্গ হতে লাগলো। বড় নদী। সাতার কাটতে হবে। মাসুমার আব্বা পাঞ্জাবি খুলে ফেলে লুঙ্গিটাকে কাছা মারলেন। আর মেয়েকে বললো, মাসুমা, তাড়াতাড়ি শাড়ি খোল। নিচে পানি উঠে তলিয়ে গেছে। ছয় সাতজন কাটা পড়েছে। লঞ্চ এখনি তলাবে।

আমিও প্যান্ট খুলে শুধু আন্ডারওয়ার পরে রেডি হলাম। কিন্তু মাসুমা শাড়ি খুলতে অস্বীকৃতি জানালো। সে মরবে তবু শাড়ি খুলবে না। তাকে বোঝালাম, দেখো, সব সময় লজ্জা করা ভালো না। এতো বড় শাড়ি নিয়ে তুমি সাতার কাটতে পারবে না। তুমি ওটা খুলে ফেলো।

সে এবার রাজি হলো এবং শাড়িটা খুলতে লাগলো। আমি সম্মোহিতের মতো দেখতে লাগলাম।

নীল শাড়িটা আস্তে আস্তে পায়ের কাছে পড়তে লাগলো। সবাই যখন বয়া নিয়ে বাচার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে তখন আমি এক দৃষ্টিতে পেটিকোট ও ব্লাউজ পড়া মাসুমাকে দেখতে ব্যস্ত।

এদিকে দাদি তো কাদতে কাদতে অস্থির। হে আল্লাহ! তুমি আমার জীবন নিয়ে আমার নাতিকে বাচাও। *লা ইলাহা ইল্লা আনতা...।*

কিছুক্ষণ পর লঞ্চ একটি চরে পৌছালো। আমরা সবাই ওখানে নামলাম। কিন্তু মাসুমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। কারণ কয়েকটি লঞ্চ ওই চরে ভিড়েছিল। তার কোনটিতে যে তারা উঠেছিল জানতে পারিনি।

বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম থেকে

অন্য বাসর

– সুফিয়ান খান

শাড়ি পরা অবস্থায় সুমিকে দেখা এ আমার বহুদিনের ইচ্ছে হলেও কখনো এ ইচ্ছের কথা তার কাছে প্রকাশ করিনি। এর অবশ্য দুটি কারণও ছিল। প্রথমত. বাসর রাতে তাকে প্রথম শাড়ি পরা অবস্থায় দেখার দৃশ্যটি আগেই পূরণ করার কোনো মানে হয় না। দ্বিতীয়ত. শাড়ির প্রতি এক ধরনের বীতশ্রদ্ধ ভাব। বঙ্গললনা ও শাড়ি একই সূত্রে গাথা হলেও বঙ্গললনাদের ইদানীং কালের শাড়ি পরার নামে শরীর দেখানোর অঘোষিত প্রতিযোগিতাই বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ। তবু শাড়ির প্রতি অন্য রকম একটা টান যে আমাদের আছেই তাকে অস্বীকার করতে পারি না। আর এ শাড়িকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে যায় যা নিজের জীবনকেই অন্য রকম করে দেয়।

সুমির বাইশতম জন্মদিন আসছিল। জন্মদিন কিংবা অন্য কোনো উপলক্ষে তাকে যেসব উপহার দিই তাতে কখনো শাড়ির কথা চিন্তাই করিনি। কিন্তু এবারের জন্মদিন উপলক্ষে সে নিজেই সিলেক্ট করে দেয় শাড়ি উপহার দেয়ার জন্য। তার কথা, তোমাকে নিষেধ করলেও যেহেতু উপহার দেবেই তাই আমি সিলেক্ট করে দিলাম এ জন্মদিনে কি উপহার দেবে। তার সিগনাল পাওয়ার পর বিভিন্ন মার্কেটে গিয়ে পছন্দসই শাড়ি খুজতে থাকি। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় শাড়ি কিনতে গিয়ে বিপাকে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বারোশ পঞ্চাশ টাকায় একটি শাড়ি কিনেও ফেললাম। পাচ মে তারিখে তার হাতে শাড়িটা দিয়ে বললাম, আগামীকাল এ শাড়ি পরে আমার সামনে হাজির হবে।

জন্মদিনে অপেক্ষার পালা শেষে বিকাল পাচটায় সে যখন রিকশা থেকে নেমে আমার কাছে এসেছিল তাকে দেখে মুহূর্তেই আমার এতোক্ষণের ভাবনা ওলট–পালট হয়ে গেল। অবশ্য আমি ভেতরে ভেতরে খানিকটা খুশিও হয়েছি এ জন্য, শাড়ি নিয়ে আমার যে স্বপ্ন ছিল সে স্বপ্নটি এখন পর্যন্ত জীবিতই থাকলো। যদিও গতানুগতিকভাবে প্রশ্ন করা যেতো, তুমি শাড়ি পরে আসনি কেন। কিন্তু সালোয়ার কামিজ পরা তাকে শাড়ি সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নই করলাম না।

সেদিন বিদায়ের সময় হঠাৎ সুমি আমাকেই প্রশ্ন করলো, তোমার দেয়া শাড়ি কেন পরলাম না এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করলে না যে।

তার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বললাম, হয়তো শাড়িটি তোমার পছন্দ হয়নি তাই পরে আসোনি। আমার কথায় সে খানিকটা আহত হয়ে বললো, আমার প্রতি তোমার এই ধারণা? আসলে শাড়িটি আমি ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ভবিষ্যতের কথা তুমি বলছো।

যেদিন বৌ হয়ে তোমার ঘরে যাবো সেদিন এ শাড়ি পরেই যাবো।

তার কথায় ভীষণ খুশি হয়ে বললাম, তুমি সত্যি অসাধারণ। শাড়ি নিয়ে আমার মনে যে স্বপ্ন ছিল, তোমার কথায় আমার সে স্বপ্নেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো।

কিন্তু দশ মাস পরে আমার সব স্বপ্ন ভঙ্গ করে পারিবারিক চাপে সুমির অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়। এরপর বিশেষ প্রয়োজনে নেপাল যাই। দেশে ফিরে এসে যখন তার বিয়ের কথা জানতে পারি,

মুহূর্তেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। কি করবো বুঝতে পারলাম না। পরদিন তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু সে তখন ঢাকার বাইরে থাকায় ব্যর্থ হই।

সময় পেরিয়ে যায়, বহুবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এক সময়ে যোগাযোগের চেষ্টা থেকে বিরত থাকি। বছর গড়িয়ে তার আর একটি জন্মদিন আসে। স্বপ্নের সাজে সুমিকে দেখতে না পারার কষ্টে জীবন ওলট-পালট হয়ে যায়। যাকে নিয়ে জীবনের সব আয়োজন সেই আজ অন্য ঘরে। সব কিছু শুধুই অর্থহীন মনে হয়। না পাওয়ার যন্ত্রণা এ সময় মহা বিদ্রোহী রূপ ধারণ করে। আবার তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি আমার কিছু প্রশ্ন নিয়ে। সরাসরি তার বর্তমান অবস্থানে গিয়ে হাজির হই। বাসায় তার হাজব্যান্ড না থাকলেও অন্যদের উপস্থিতি আমাদের কথাবার্তায় ব্যাঘাত ঘটায়।

এক পর্যায়ে অনুরোধের স্বরে সে বললো, তুমি এখান থেকে চলে যাও আগামীকাল কিংবা পরশু আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

সকাল এগারো বারোটার মধ্যে তার আসার কথা। অপেক্ষায় সময় কাটতে লাগলো। সাড়ে এগারোটায় কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি সে এসে উপস্থিত। আরো বিস্মিত হলাম আমার দেয়া শাড়িটি তার পরনে দেখে। কতো স্বপ্নের এ দৃশ্য আজ সত্যি। খুশিতে হার্টবিট বেড়ে যাবার পরিবর্তে উল্টোটাই মনে হলো। তাকে ভেতরে আসতে বলে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

সে আমার পাশেই সোফায় বসে কোনো প্রকার ভনিতা না করেই বললো, কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আসিনি। বাসর রাতে আমাকে নিয়ে যা করতে, ইচ্ছে করলে এখনই তুমি তা করতে পারো।

নিজেকে সন্ন্যাসী ভাবার অবকাশ পেলাম না। তার নরম স্তন যুগলে হাত রেখে তাকে জাপটে ধরে বললাম, কিন্তু আমি তো শুধু শারীরিকভাবে তোমাকে চাইনি।

আমার বুকে মাথা রেখে কান্না জড়িত কণ্ঠে সে বললো, আমি মানসিকভাবেও তোমারই আছি।

তার অশ্রুর কয়েক ফোটা আমার শরীর বেয়ে পড়তে লাগলো সে অশ্রু মনের ক্ষোভগুলো খানিকটা শীতল করে দিলেও তার শরীরের উত্তাপ আমাকে অস্বাভাবিক করে দিল।

যাবার বেলায় সে বললো এ শাড়ি আবার সেদিনই পরবো যেদিন আবার তোমার কাছে আসবো। নয়তো সারাটি জীবন এটি সংরক্ষণ করে যাবো।

তার কথার প্রতিউত্তরে কথা বলার ভাষা খুজে পেলাম না। শাড়ি পরা অবস্থায় আজ তাকে যতোটা অসাধারণ লাগছে, অন্য কোনো সময় তাকে এতোটা অসাধারণ মনে হয়নি। মুহূর্তে শাড়ির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাবটা দূর হয়ে অন্য রকম এক অনুভূতি এলো।

পূর্ববিঘা, কাঞ্চনপুর, লক্ষ্মীপুর থেকে

পট পরিবর্তন

– মুহম্মদ মহসীন

বাবার সংসারে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যেও কতো যে সুখ স্মৃতি আছে তা হিসাব করে বলতে পারবো না। তবে দুঃখের স্মৃতি খুব একটা নেই। যাযাদি ইতিমধ্যে কতো বিশেষ সংখ্যা বের করেছে। কিন্তু কোনো

সুখ স্মৃতি ঘটনার কথা উল্লেখ করে লেখার মতো কিছু খুজে পাইনি। শাড়ি নিয়ে লেখা আহ্বান করলে দশ বছর আগের একটা ঘটনার কথা আজ স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। আমার বাবার সরকারি চাকরিটা মোটামুটি ভালো হলেও ভাড়া বাড়িতে চার ভাইবোনের কলেজ-ইউনিভার্সিটির লেখাপড়ার খরচ বহন করে আমাদের জন্য, ভালো কিছু কেনাকাটা বাবার জন্য প্রচণ্ড কষ্ট সাধ্য হয়ে দাড়াতো। তার ওপর লেখাপড়া তথা বেকার অবস্থায় ভালোবেসে এক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলি।

আজকের ঘটনাটা দশ বছর আগে আমার মাস্টার্স পড়ুয়া বোনকে নিয়ে। একদিন এক বিয়ের পাত্র আমার বোনকে দেখতে আসে। আমার মায়ের এবং বোনের তেমন কোনো ভালো শাড়ি ছিল না যা পরে পাত্রের সামনে যাওয়া যায়। তাই আমার স্ত্রীর বাবার দেয়া ইনডিয়ার দামি জামদানি শাড়িটা পরেই পাত্রের সামনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। দেখাদেখির পর্ব শেষ হওয়ার পর শাড়িটা খোলা জানলার পাশে আলনায় রাখলে জানলার ফাক দিয়ে কোনো এক ছিচকে চোর নিয়ে যায়। চুরির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আমার স্ত্রীর সে কি কান্না। কান্নাই শেষ নয়।

আমার বোনকে ডেকে বললো, কেনার যখন সামর্থ নেই তখন অন্যের শাড়ি পরে বড়লোকি না দেখানোই ভালো। তোমাদের হতদরিদ্র ঘরে এসে কোনো স্বাদ-আহ্লাদ তো পূরণ করতে পারিনি। তার ওপর আমার বাবার দেয়া শাড়িটা খোয়ালে। তুমি আসলে অপয়া। তোমার বিয়ে হওয়া অতো সহজ নয়।

আজ আমার সেই বোনের স্বামী একজন বিসিএস ক্যাডারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার শাড়ির সংখ্যা যে কতো এবং কতো দামি শাড়ি পরে তা আমার জানা নেই। তবে আমার অসচ্ছল সংসারে আমার স্ত্রীর দেয়া অপবাদ *অপয়া* বোনটি বর্তমানে ভাগ্যবতী। আমার স্ত্রীকে ঘরে পরার এবং বাইরে বেড়ানোর অনেক শাড়ি প্রায়ই উপহার দেয়। *রাখীবন্ধন* উপলক্ষে আমার প্রাপ্য উপহারটি আমাকে না দিয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে বলে, ভাবী তুমি সুখী হও। তখন আমি অতীতের সেই ঘটনার কথা মনে করে লজ্জা পাই, আমার স্ত্রী পায় না।

কামারখালী, ফরিদপুর থেকে

লক্ষ্মী বৌ

– মাকসুদ

দেশ থেকে পাচ মাস ছুটি কাটিয়ে আসার পর থেকেই মন মেজাজ খারাপ। কোনো কিছুতেই স্থির হতে পারছি না। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে টুইন টাওয়ারের মতো নিজেকে ধ্বংস করে দিই। তাও পারি না। পেছন থেকে এক শাড়ির আচল যেন বার বার টেনে ধরে রাখে।

হ্যা, তারই শাড়ির আচল যে কি না আমার হৃদয়ের স্পন্দন। তার সঙ্গে মন দেয়া-নেয়ার এক বছরের সময় চলে আসতে হলো মরুভূমির এই দেশে। কথা ছিল দুই বছর পর দেশে ফিরে তাকে নিয়ে সুখের ঘর বাধবো। বিধি বাম। জীবন ঘড়ির কাটা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করলো। প্রথম বছর নিয়মিত চিঠি নেয়া-দেয়া ছিল স্বাভাবিকভাবে। এরই মাঝে জানাজানি হয়ে যায় দুই পরিবারে। কেউ সহজে মেনে নিতে পারলো না এ সম্পর্ক। আমার পরিবার থেকে কড়া নিষেধ এলো এবং এর সঙ্গে তার নামে

মিথ্যা অপবাদ। এসব বিশ্বাস করে একেবারেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। আমার দুই বছরের সফর পরিণত হলো নয় বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসনে।

দীর্ঘ নয় বছর মরুবাসের পর অতীতকে ভুলে গিয়ে সংসার গড়ার স্বপ্ন নিয়ে চলে এলাম দেশে। ততোদিনে তার বিবাহিতা জীবন দুই বছর কেটে গেছে। মনে মনে ভেবেছিলাম হয়তো কোনোদিনই এ কাপুরুষটার সামনে আসবে না সে। হয়েছে তার উল্টো। বাসায় পৌছার আধঘণ্টার মধ্যে আমার সামনে এসে সে হাজির। চেহারা দেখে বুঝতে বাকি রইলো না কোথাও কোনো বড় ভুল হয়েছে।

পরে জানলাম বিয়ের আগে সে আমার বাসা থেকে আমার ঠিকানা চেয়েছিল। তাকে জানানো হয়েছে আমি নাকি এ মরুদেশে বিয়ে করেছি এবং দুই সন্তানের জনক। শেখ হাসিনা তার পিতা শেখ মুজিবকে *জাতির জনক* বানাতে কতো কষ্ট করেছিলেন, অথচ আমাকে কতো সহজে দুই সন্তানের জনক বানিয়ে দিল আমার পরিবার।

তার কাছ থেকে আরো জানলাম তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে এখনো নাকি আমি। আর স্বামীর সঙ্গে করে যাচ্ছে সংসার নামের অভিনয়। তার মুখ থেকে এ কথা শোনার পর মনে হলো হিরোশিমায় নয়, এটম বোমা পড়েছে আমার হৃদয়ের ওপর যেখানে আবেগ নামে আর কোনো কিছু নেই, আছে শুধু পোড়া গন্ধ।

ভাগ্যের পরিহাসকে মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, যতোদিন বেচে থাকবো একাই থাকবো।

এভাবে আরো কিছুদিন কেটে গেল। প্রতিদিন দেখা হতো, কথা হতো তার সঙ্গে। আর তার মুখ থেকে শুনতাম, এখনো ভালোবাসি তোমাকেই।

আমার বাসার দুটো বিল্ডিং সামনে ছিল তার বাসা এবং পেছনের বাসা ছিল তার মায়ের। অর্থাৎ আমার ফুপুর বাসা, মানে সে ছিল আমার ফুপাতো বোন। মাঝে মাঝে বিকেলে ফুপুর বাসায় যেতাম। একদিন বিকেলে ফুপুর বাসায় বসে আছি এমন সময় সেও এলো। পরনে ছিল গোলাপি শাড়ি। শাড়ি পরা তাকে দ্বিতীয়বারের মতো দেখলাম। এমনিতে সব সময় সালোয়ার কামিজ পরে। প্রথমবার শাড়ি পরা দেখেছি এক ঈদের সময়। আমাকে দেখানোর জন্য পরেছিল। আমাকে দেখেই বললো, বারান্দা থেকে দেখলাম তুমি এদিকে যাচ্ছো। তাই তোমাকে দেখতে এলাম।

তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ফুপু আর উঠতে দিলেন না। না খেয়ে যেতে দেবেন না। অগত্যা তার সান্নিধ্য পাবো বলে রাজি হয়ে গেলাম। তার স্বামীকে টেলিফোনে জানানো হলো অফিস থেকে সোজা এ বাসায় আসার জন্য।

ভদ্রলোক সব সময় সন্ধ্যার পরই বাড়ি ফেরেন। লোকটার সঙ্গে আমার অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গেছে। সেদিনও তিনি সন্ধ্যার পরই বাড়ি ফিরলেন। এসেই আমাদের সামনে। এখন আমার সামনে বসে আছে আমার প্রিয়তমা অথচ অন্যের পাশে। এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায়? ইচ্ছা করলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।

মনই মনকে বুঝতে পারে। তাই হয়তো আমার অবস্থা বুঝতে পারলো সে। সে হঠাৎ করে তার স্বামীকে বললো, শাড়িটা কেমন গরম লাগছে। চলো বাসায় গিয়ে বদলে আসি।

ভদ্রলোক অনেকটা কর্কশ ভাষায় জবাব দিলেন, তোমার গরম লাগে তো তুমি যাও। মাত্র অফিস থেকে ফিরলাম, এখন কোথাও যেতে পারবো না।

ইচ্ছা হলো ব্যাটার দুই গালে দুটো কষে চড় বসিয়ে দিই যে কি না আমার জীবন, আমার সামনে তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার! অথচ পারলাম না। দাতে দাত কামড়িয়ে সহ্য করতে হলো। আমার দিকে ইঙ্গিত করে সে আবার বললো, ঠিক আছে তুমি বসে বসে বিশ্রাম নাও। আমি তাহলে একে নিয়ে যাই।

ভদ্রলোক অনুমতি দিলেন আর আমি মনে হয় এরই অপেক্ষায় ছিলাম। তার সঙ্গে রওনা হলাম তার বাসায়। উদ্দেশ্য, শাড়ি বদলিয়ে ফিরে আসা। মাত্র পাচ মিনিটের পথ। পথিমধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশবার শুনেছি, এখনো তোমাকেই ভালোবাসি।

তার ফ্ল্যাটে এসে পৌছালাম। আর কেউ নেই, আমরা দুজন মাত্র। বাসায় প্রবেশ করে ড্রয়িংরুমে বসার জন্য পা বাড়ালাম। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বেডরুমে। তার সামনে বসে আছি।

ড্রয়ার থেকে সালোয়ার কামিজ বের করে বললো, তুমি বসো। আমি বাথরুম থেকে চেঞ্জ করে আসি।

বেডরুমের পাশেই লাগোয়া বাথরুম। পা লম্বা করে গতিরোধ করে বললাম, তুমি কি সত্যিই আমাকে এখনো ভালোবাসো?

গত সাত দিন সাত হাজারবার তোমার এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

তাহলে বাথরুম কেন? এখানে তো আর কেউ নেই। আমার সামনে শাড়ি পাল্টাতে পারবে না?

আবারও পরীক্ষা নিতে চাও? বলেই আমার সামনে একে একে শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট খুলে ফেললো। শুধু প্যান্টি এবং ব্রা পরা।

এ রকম তাকে তো দেখেছিলাম দশ বছর আগে একদিন। সেদিন এ অবস্থায় তার শরীরের তিল গুণেছিলাম। তিলের সংখ্যা গুণে বলার পর সে বলেছিল, একটা কম গুণেছো। এখনো ভালো করে গুণতে শেখোনি?

হতেই পারে না। গণিতে লেটার মার্ক নিয়ে পাস করেছি। আর আমার গোনা ভুল হবে?

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিশ ফিশ করে সে বলেছিল, একটা তুমি এখনো দেখোনি। সেটা প্যান্টির নিচে। ওটা দেখে সঠিক সংখ্যা বলো।

আজ দশ বছর পর একই অবস্থায় তাকে দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকলাম। তারপর সালোয়ার কামিজ হাতে তুলে দিয়ে বললাম, পরে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কেন? আজ তিল গুণবে না?

নিজের হাতেই সালোয়ার কামিজ পরালাম তাকে। তার মুখ পানে চেয়ে আছি। কোনো কথা নেই কারো মুখে।

কিছুক্ষণ পর পাশে পড়ে থাকা শাড়িটা আমার মুখের ওপর মেরে কাদতে শুরু করলো আর বললো, এটা তোমার পরা উচিত। কাল মার্কেট থেকে চুড়ি কিনে দেবো, শাড়ি–চুড়ি পরে ঘরে বসে থেকো। যার লক্ষ্মী বৌকে অন্যের ঘর করতে হয় তার এটাই করা উচিত।

শাড়িটার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আর শাড়ি থেকে শরীরের সুবাসিত গন্ধ নিচ্ছি। মনে পড়ে তাকে আগে সব সময় *লক্ষ্মী বৌ* বলে ডাকতাম। এ মুহূর্তে হয়তো সে অন্য কোনো উত্তর আশা করছে আমার কাছ থেকে। হয়তো বা আবার ফিরে আসার। কিন্তু এ কি করে সম্ভব! আমার ভুলের

জন্য তাকে চলে যেতে হলো অন্যের ঘরে। ভুলের মাশুল স্বরূপ হয়তো সারা জীবন আমাকে থাকতে হবে এভাবে একা হয়ে। নিজেকে শেষ করতেও পারবো না পেছন থেকে টানা শাড়ির আচলের জন্য।

সউদি আরব থেকে

বাক্সবন্দী

– রুমানা আফরোজ রুমি

আমার ছেলে পুতুলের বিয়ে। দরকার লাল বেনারসি। না হলে মেয়েপক্ষের কাছে সম্মান থাকে না। তাই মায়ের বিয়ের বেনারসিটাই কেটেছিলাম ব্লেড দিয়ে। এর জন্য মা আমায় কি মারটাই না মেরেছিলেন।

আজো আলমারিতে অতি যত্নে বাক্সবন্দী মায়ের সেই বেনারসিটা যখন দেখি তখন বুক ভেঙে কান্না আসে। কারণ এই বেনারসিটা যত্ন করার জন্য মা আর আমাদের মাঝে নেই।

বরিশাল থেকে

আত্মহত্যা

– মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

নিজের জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য ফাসিকে উপযুক্ত পন্থা হিসেবে অনামিকা বেছে নিল। ফাসি দেয়ার জন্য রশি সংগ্রহ করতে না পেরে শাড়ি পেচিয়ে রশির মতো বানালো। যে বস্তু শরীর ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয় তা আজ মৃত্যুর কাজে ব্যবহৃত হবে। অনামিকা ঠিক করলো সিলিং ফ্যানের মধ্যে শাড়িটি বাধবে। তার আগে দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। না হলে কেউ দেখে ফেলেন ঠিকমতো মরতেও দেবে না। দৌড়ে এসে পা দুটো উচিয়ে ধরবে। গলায় শাড়িটি আটকে থাকবে বিশ্রীভাবে। এমন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটার কোনো মানেই হয় না।

একটি ছেলেকে অনামিকা প্রচণ্ড ভালোবাসতো। ছেলেটি তার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছেলেটির কথাবার্তা, তার আচরণ অনামিকার এতো বেশি ভালো লাগতো যে, সব সময় তাকে দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হয়। তার সঙ্গে যখন কথা বলে তখন অনামিকা এক ধরনের ঘোরের মধ্যে থাকে। এভাবে চললো কিছুদিন। ধীরে ধীরে অনামিকার মধ্যে প্রেমের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে লাগলো। তার পৃথিবী ছোট হয়ে ছেলেটির মধ্যে কেন্দ্রিভূত হয়ে গেল। শেষে অনামিকা লজ্জা, অস্বস্তি, ভয় নামে সব বাধা উপেক্ষা করে তার হৃদয়ের সবচেয়ে সুন্দর, উচ্চ শ্রেণীর আবেগের কথা ছেলেটিকে জানিয়ে দিল।

সরাসরি বলার সাহস সঞ্চয় করতে না পেরে একটি কাগজে তার হৃদয়ের এই অদ্ভুত অনুভূতির কথা লিখে ছেলেটির হাতে দিল। অথচ ছেলেটি তার উপযুক্ত মর্যাদা দিল না। সে তার বন্ধুদেরকে ডেকে এনে চিঠিটি জোরে পড়ে শোনালো। আর তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করে হাসাহাসি করলো। অনামিকা তিন তলার ওপর দাড়িয়ে সমস্ত দৃশ্য দেখছিল। তার প্রায় কান্না চলে আসে। সারা রাস্তা সে কেদে বাড়ি ফেরে।

অনামিকার জীবন এখন শূন্য। তার কোনো উদ্দেশ্য, কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে বলে মনে হয় না। সব কিছু অর্থহীন মনে হয়, এমনকি বেচে থাকাও। অবশেষে তার সঠিক বিবেচনার ঘাটতির কারণে সে মৃত্যুর পথ বেছে নিল।

অনামিকা দরজা জানালা বন্ধ কবে শাড়িতে গিট দিতে শুরু করলো। শাড়ির বদলে রশি হলে ভালো হতো। শাড়িতে গিট দিতে তার যথেষ্ট সময় লাগছে। আজরাইল হয়তো অপেক্ষা করতে বিরক্ত হচ্ছেন। অনামিকা চেয়ারের উপর দাড়িয়ে শাড়িটি সিলিং ফ্যানে বাধলো। তারপর ফাসিটি গলায় ঢোকালো।

ব্যাস, এবার পা দিয়ে চেয়ারটি ফেলে দিলেই হলো। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য একটি জগতে চলে যাবে সে। বেহেশত? না, আত্মহত্যা করে বেহেশেতের আশা করা ঠিক না। দোজখে যাবে সে। সেই ভালো। পৃথিবী নামক দোজখে বাস করার চেয়ে অন্য একটি দোজখে বাস করা ভালো। তাছাড়া দোজখ–বেহেশত বলে কিছু আছে কি না তাও চূড়ান্ত জানা যাবে।

অনামিকা ভেবে দেখলো, ফাসি দেয়ার আগে তার কোনো কাজ বাকি আছে কি। যদিও তেমন কোনো কাজ নেই তবে রোকনমামার জন্য তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স–এর প্রফেসর। তার উৎসাহের ফলে অনামিকা এ পর্যন্ত পড়ালেখা করতে পেরেছে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের পার্থক্য। অনামিকার সারা জীবনের পরিশ্রম রোকনমামার আন্তরিক উৎসাহ সব ভেস্তে যাবে। অনামিকা যাকে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করে তিনি হলেন রোকনমামা। মামার প্রতিটি বাণী তার মনে আছে। একবার অনামিকা ও তার বোন ভাত খাচ্ছিল। ভাত গরম হওয়ায় তারা ফু দিয়ে ঠাণ্ডা করছিল। দৃশ্যটি দেখে রোকনমামা বলেছিলেন, এটা কি জানো? এটা হলো অসহিষ্ণুতা। ভাত তো এক সময় ঠাণ্ডা হবেই তারপরও ফু দেয়ার কি দরকার।

কথাটি অনামিকার হৃদয়ে গেথে গিয়েছিল। মামার আর একটি কথা অনামিকার ভালোভাবেই মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, রেগে গিয়ে কিংবা আবেগে পড়ে কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। কারণ এক্ষেত্রে প্রায়ই সিদ্ধান্ত ভুল হয়। অনামিকা একটু থামলো, তারপর ভাবলো, সে এখন যা করতে যাচ্ছে সেটা ভুল নয় তো! সে আবেগে পড়ে কোনো কাজ করছে না তো? পরক্ষণেই ছেলেটির কথা মনে পড়লো, যে অনামিকার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি নিয়ে হাসাহাসি করছে তার বন্ধুদের সঙ্গে। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে অনামিকার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এলো। সে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলো না। পা দিয়ে চেয়ারটি ফেলে দিল। তারপর...।

তারপর সিলিং ফ্যান থেকে শাড়ির গিটটি খুলে গিয়ে অনামিকা সোজা মেঝেতে আছড়ে পড়লো। পতনের গতি হাত দিয়ে থামাতে গিয়ে মট মট জাতীয় শব্দ হলো।

নির্ঘাত হাতের হাড় ভাঙার শব্দ।

দক্ষিণ হাজীপাড়া, ঠাকুরগাও থেকে

ফেরিওয়ালা

– শওকত হোসাইন সৈকত

ভরদুপুরে কাকেরা যখন একটু ছায়া খোজে তখন ক্লান্ত পথিক একটু বিশ্রামের খোজে বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, আর তখন ছাতা মাথায় হাক দিয়ে চলেছে ফেরিওয়ালা, এই শাড়ি লাগবে, শাড়ি। জনি পৃন্ট, পাকিজা, পৃন্ট, কেয়া, বৌরানী, জামদানি, বেনারসি, কাতান, শাড়ি...। পাছে বোঝা মাথায় নিয়ে পুচকে ছেলেটা। তপ্ত রোদের মধ্যে ফেরিওয়ালা হাকটা কাকের ডাকের মতো কর্কশ শোনায়।

এই শাড়িওয়ালা।

ডাক আসে মধ্যবিত্ত একটি ঘরের দরজা থেকে।

উঠানে শাড়ির বোঝাটা মাথা থেকে নামায় ছেলেটা।

কি শাড়ি নেবেন আপা? বোঝা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করে ফেরিওয়ালা।

কয়েকটা সুতি শাড়ি পাঠান। ঘরের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে আসে।

ফেরিওয়ালা ছাতা গুটিয়ে লুঙ্গিতে মুখের ঘাম মুছে কয়েকটা শাড়ি ছোটছেলেটিকে দিয়ে ঘরের ভেতর পাঠিয়ে দেয়।

আবার নারী কণ্ঠ বলে, আরো কিছু শাড়ি পাঠান।

ফেরিওয়ালা দ্বিতীয় কিস্তিতে আরো কিছু শাড়ি পাঠায়।

এভাবে তৃতীয় কিস্তিতে পাঠায় আরো কিছু।

দুটো শাড়ির দাম কতো?

ঘর থেকে প্রশ্ন আসে।

ফেরিওয়ালা বলে, আড়াইশ করে পাচশ।

চারশ–তে দেবেন?

ফেরিওয়ালা বলে, না, হবে না।

অবশেষে সাড়ে চারশ টাকায় শাড়ি দুটো বিক্রি হয়।

বাকি শাড়িগুলো পাঠিয়ে দেয়া হয়।

টাকা বুঝে নিয়ে ফেরিওয়ালা গুণে গুণে শাড়ি বুঝে নিচ্ছিল।

একটু পর ফেরিওয়ালা বললো, ঘরে আরেকটা শাড়ি আছে আফা, শাড়িডা পাঠিয়ে দেন।

ঘরের ভেতরের পর্দানশিনদের পর্দায় যেন জোরে বাতাস লাগলো।

কি বলছো অসভ্য কোথাকার। ঝাঝালো বিশ্রী কণ্ঠস্বর।

দুটো শাড়ি রেখেছি, দুটার দামও দিয়েছি আর শাড়ি আসবে কোথা থেকে।

ফেরিওয়ালা নম্রস্বরে আগের মতোই বলে, আছে আফা, ভালো কইরা খুইজ্জা দেহেন।

ঘরের ভেতর থেকে দুই তিনটা নারী কণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে হুমকি–ধামকি আসে। ফেরিওয়ালা ততোধিক নম্রস্বরে বলে, দেহেন আফা, এই লাইনে আমরা বহুত পুরান। এই রহম কেইস সপ্তায় দুই

তিনডাই ঘড়ে, হুদা প্যাচাল পাইরেন না। ভালায় ভালায় শাড়িডা দিয়া দেন। নাইলে আমি ঘর চেক করুম।

এবার ঘরের ভেতর মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়, টুংটাং শব্দ শোনা যায়। দশ পনেরো মিনিট কেটে যায়।

তীব্র তিরস্কারের স্বরে ছিঃ, ছিঃ শোনা যায়।

ঘরের ভেতর থেকে চা বিস্কুট আসে।

এক গ্লাস পানি দ্যান আফা। বললো, ফেরিওয়ালা।

পানি চা পানের পর একটা ছোট ছেলে চোখ মুছতে মুছতে ঘরের শাড়িটা ফেরত নিয়ে আসে।

ভাই, কিছু মনে করবেন না, ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে।

ও ছোট মানুষ, না বুঝে শাড়িটা বালিশের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল, ওর হয়ে আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

মিনতি ঝরছে কণ্ঠ থেকে।

ফেরিওয়ালা বুঝলো, এ জন্য ছেলেটা মার খেয়েছে।

লুঙ্গির কোচা থেকে পানের বাটা বের করে পান মুখে পুরে রঙিন, বিজয়ী মুখে সে বললো, নাহ, কিসসু মনে করি নাই।

ঘটনাটি ছিল বারো বছর আগের। আর সেই ছোট চোরটা ছিলাম আমি।

যুগীরঘোল, ভোলা থেকে

মে মাস

– ত্রিরা

আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্রী। ভালো ছাত্রী হিসেবে স্কুলে ও পাড়ায় আমার খুব ভালো সুনাম। তাছাড়া আমার বাবাকে এক নামে এলাকাতে সবাই চেনে। সেই সূত্রে আমি আরো বেশি পরিচিত। তখন থেকেই ছেলেরা প্রতিদিন দুই থেকে তিনটা চিঠি দিতো আমাকে। ধরেও দেখতাম না এগুলো।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর আমাদের পাশের বাসার এক ছেলে আমার কাছে এসে বললো, আমাকে কিছু অংক বুঝিয়ে দেবে, আমি অংকে খুব কাচা। তাছাড়া আমরা গরিব মানুষ, প্রাইভেট পড়ার মতো টাকাও আমাদের নেই। তুমি যদি দয়া করো তাহলে আমি প্রতিদিন এসে দুই একটা অংক বুঝে গেলে আমার খুবই উপকার হবে।

আসলে স্কুলে কোনো ছেলে বা মেয়ে অংক বুঝতে চাইলে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। তাই তার কথা না রেখে পারলাম না। তাছাড়া গরিব কথাটি আমার হৃদয়ে খুবই আঘাত করলো।

পরদিন থেকে যথারীতি সে অংক কষতে আসে আমার কাছে। আমার মা কিছু বলতেন না। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন বিকেলে সে আর তার এক চাচাতো ভাই সোহেল ক্যামেরা নিয়ে আমাদের বাসায় আসে। এবং এক সময় আমার একটা ছবি তোলার কথা বলে। আমি ভাবলাম ঠিক আছে তোলো। সে ক্যামেরাটা চাচাতো ভাইয়ের কাছে দিয়ে আমার ছবি তুলতে বললো। তার চাচাতো ভাই সোহেল আমার ছবি তুলতে লাগলো। বেশ কয়েকটা ছবি তোলার পর যখন বললো হ্যা

তোলা হয়েছে তখন দেখলাম সে আমার পেছন থেকে বের হচ্ছে। ভাবলাম হয়তো খাটের ওপর বসেছিল। এরপর থেকে আমার কাছে আর পড়তে আসতো না।

এভাবে কিছুদিন গেলে বড় খামের মধ্যে সব কয়টা ছবি ও দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার এক চিঠি পাঠালো আমার কাছে। ছবিগুলো খুলে দেখার পর মাথা আমার ঘুরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আকাশ ও মাটি দুই–ই আমাকে এক সঙ্গে চাপ দিচ্ছে। হায় আল্লাহ! সব ছবিতে সে আমার সঙ্গে। তাছাড়া এতো ঘন হয়ে দাড়ানো যুগল ছবি। এরপর সব বুঝতে পারলাম যে, তারা আগে থেকেই এই ফন্দি করে আমার পেছনে দাড়িয়ে ছিল যাতে এক সঙ্গে ছবি আসে এবং চিঠিতে লিখেছে, *এই ছবি আমি সবাইকে দেখিয়ে বলবো যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো। আর সব নেগেটিভ তুমি পাবে যদি আমার সঙ্গে মে মাসের ৮ তারিখে দশটার সময় বটতলা বাসস্ট্যান্ডে দেখা করো।*

আমি এই কথা কাউকে বলতে পারিনি। স্বভাবত আমি একটু বোকা ও চাপা টাইপের ছিলাম। যেদিন ৮ তারিখ এলো তার আগের রাত আমি ছটফট করে কাটিয়েছি। কয়েকদিনের চিন্তায় চোখের নিচে কালি পড়ে গিয়েছিল বলে মা বলতেন রাত জেগে বেশি পড়িস না। কিন্তু মাকে বলতে পারিনি কিছুই। এরপর বটতলা গেলাম। সে, সোহেল, সাহেব মিয়া আগেই টেম্পো ভাড়া করে সেই জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি যাওয়ার পর বললো, তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠো।

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তারা গাড়ি ছেড়ে দিল। কোথায় যাচ্ছি কিছুই জানি না। তারপর দোকানের সাইনবোর্ড দেখে বুঝলাম যে, এলাকাটি দাউদকান্দি। ওখানকার আরো সাত আটটা ছেলে তার সঙ্গে যোগ হলো। কেন যেন আমার খুব ভয় করছিল। তারপর একটা বাড়িতে আমাকে নিয়ে আসে এবং একটা খাতায় সই করতে বলে। কেন সই করছি, কি সই করছি তা কিছুই জানি না। প্রায় আধা ঘণ্টা যাওয়ার পর সে আর সব কয়েকটা ছেলে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এরপর বললো, চলো। আমি উঠলাম। এবং কিছুক্ষণ পরেই একটা ছেলে আমাকে ভাবী বলে ডাকতে লাগলো। আমি তো আতকে উঠলাম। জোরে ধমক লাগালাম। বললাম, এসব কি বলছেন? আর তার দিকে তাকিয়ে নেগেটিভ চাইলাম।

সে পর্দার ফরিদীর মতো বিকট শব্দে হেসে উঠলো। আমার অন্তর আত্মা শুকিয়ে গেল তখন। সে বললো, তুমি এখন থেকে আমার বিয়ে করা আদরের বৌ। নেগেটিভ নিয়ে কি হবে?

এরপর যেন আমি বধির হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর তারাই বললো, যেই কাগজে আমি সই করেছিলাম সেটা ছিল কাবিননামা।

আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না, কথাও বলতে পারছিলাম না। কিভাবে যে বাসায় আসি তার কিছুই মনে নেই। কয়েকদিন নাকি এবনরমালের মতো ছিলাম। এর কিছুদিন পরে কোর্ট থেকে চিঠি আসে। আমার ও তার পরিবারের সবাই ঘটনাটা জানলো এবং গ্রামের সবাই ঘটনায় হতবাক হয়ে গেল। কেউ ভাবতেই পারেনি আমি এ কাজ করতে পারবো। এরপর তার বাবা, মা, চাচা এসে আমাকে তাদের বাড়িতে নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেল। কারণ তার বিদেশ যাওয়ার সময় ছিল এর কিছুদিন পরেই। যাক, একটা লাল শাড়ি ও কিছু কসমেটিক্স দিয়ে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। যাওয়ার

সময় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কেদেছিলেন আমার বড় ভাই। বাবা মা আর আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

তার পরদিন চলে আসি আমাদের বাড়িতে। সঙ্গে পরা সেই লাল শাড়িটা। এরপর কিছুদিন যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম তারা সবাই এই চালের সঙ্গে জড়িত। আমার বাবার সম্পত্তির লোভে আমার কাছে পড়ার নাম করে ফাদে ফেলে বিয়ে করেছে। অথচ আজো গ্রামের সবাই জানে আমি তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি। এরপর আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় চলে আসি এবং ডিভোর্স দিই।

তারপর থেকে বাবা, মা, ভাই, ভাবী সবাই আমাকে একটা কীট মনে করে। আমি যেন সবার বোঝা। আমি ঘৃণা করি তাদের যারা আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর থেকে আমি কাউকে ভালোবাসতে পারিনি। অনেক ছেলে আমাকে ভালোবেসে কাছে পেতে চেয়েছে। কিন্তু আমি জানি যখন শুনবে আমার একটা বিয়ে হয়েছে তখন আর কেউ ফিরে চাইবে না। অশুভ মে মাস যে মাসে আমার জীবন কলঙ্কে ছেয়ে গেছে। এই সেই মাস যে মাসে লাল শাড়ি পরে তার বাড়িতে যেতে হয়েছে। এই সেই প্রতারণার মাস। পাঠক, আমার কি অপরাধ ছিল বলতে পারবেন? জানি পারবেন না। আমি নিজেও পারি না। আমি একটা দিনও এই স্মৃতি ভুলতে পারি না।

আজ আমি বিএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। এর মধ্যে আমাকে অনেক কাঠ পোড়াতে হয়েছে। আমি সব অতীত ভুলতে চাই। জানি সবাই খারাপ না। তবুও পারি না কারো বন্ধনে আবদ্ধ হতে। আমি গ্রামে যেতে পারি না শুধু তার কারণে। গেলেই তার কুৎসিত চেহারাটা আমাকে দেখতে হবে।

আমি আজ বঞ্চিত ভাইয়ের স্নেহ, মায়ের ও বাবার ভালোবাসা থেকে। আমি বঞ্চিত আমার চারপাশের পরিরেশ থেকে। হে মে মাস! তুমি কেন আমার জীবন থেকে সমস্ত ভালোবাসা কেড়ে নিলে। আমি কি করেছিলাম। ভাবী আমাকে সর্বদাই তার কথা বলে খোটা দেয়। ভাইয়াও বলেন। শুধু নীরব শ্রোতা আমি। কেন? মে মাস, তুমি কেন আমার জন্য শাড়ি নিয়ে এলে? কষ্টের মে মাস, আমাকে একটু শান্তি দাও।

ঢাকা থেকে

মুরুব্বি

– মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ ঝিলন

আমি একজন কাটা কাপড় ব্যবসায়ী। বিভিন্ন সময়ে আমাকে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর আবদার মাঝে মধ্যে পূরণ করতে হয়। সেদিন স্ত্রীকে নিয়ে কেনাকাটার উদ্দেশে বের হলাম। অন্যসব কেনার পর শাড়ির দোকানে ঢুকলাম। দোকানিকে বললাম, ভাই, আমাদেরকে শাড়ি দেখান। সেলসম্যান যখন আমাদেরকে শাড়ি দেখাচ্ছিল। এক পর্যায়ে অন্য সেলসম্যান বললো, এ্যাই, মুরুব্বি থেকে দেখাও।

তখন আমার স্ত্রী ত্বরিতভাবে বললো, না ভাই, আমার নিজের জন্য।

আমি কিন্তু ওই সেলসম্যানের কথা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। সে আমাদেরকে কি শাড়ি দেখাতে বলছে।

আমি তখন স্ত্রীকে বুঝতে না দিয়ে সেলসম্যানকে বললাম, ভাই, আমাদের শাড়ি পছন্দ হয়নি। পরে অন্য দোকান থেকে স্ত্রীর পছন্দের শাড়ি কিনেছি। আজো মনে পড়ে সেই সেলসম্যানের কথা।

পাদটিকা : মুরুব্বিকে বলতে ব্যবসায়ীরা বোঝায় খুব পুরনো কাপড়। অনেক দিনের শাড়ি বা মাল যা ক্রেতাকে সহসা খাওয়ানো যায় না।

জিয়া সুপার মার্কেট, ভোলা থেকে

চিরকুমার যজ্ঞ

–মাশরেকী ইলিয়া কাজান

আমাদের বংশে এখনো পর্যন্ত যে একজন চিরকুমারের আবির্ভাব ঘটেনি এই গুপ্ত সত্যটি অতি সম্প্রতি আমার বড়ভাইয়া উদঘাটন করেছেন। এবং তিনি প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যেভাবেই হোক এই অভাব পূরণ করতে হবে। সম্ভবত তিনিই এ অভাব পূরণ করবেন। তাই বয়স প্রায় পয়ত্রিশ হয়ে গেলেও তিনি এখনো কারো ঘোড়ায় পরিণত হননি। অর্থাৎ কোনো রমণী এখনো তার পিঠে চাপেননি। সাধারণ অর্থে বিয়ে করেননি। তার এই অবাস্তব প্রতিজ্ঞার কারণে আব্বা, আম্মা খুব চিন্তায় পড়েছেন। সকলের মুখে শুধু হায় হায়! বিশেষ করে আশপাশে দশ গ্রামে যাদের বিয়ের যোগ্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যা আছে তারা যেন গলা ফাটিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুরু করে দিয়েছেন। কারণ আমার এই হালকা বায়ুগ্রস্ত ভাইটির বংশ যেমন সম্ভ্রান্ত তেমনি যোগ্যতার দিক দিয়ে তিনি এভারেস্ট না হলেও আমাদের পাশের বাড়ির ফজলা কিওক্রাডং তো বটেই।

আমার বড়ভাইয়ের চেয়ে পনেরো বছরের ছোট হয়েও যখন একটি স্ত্রীরত্ন যোগাড় করে আনলো এবং তার সঙ্গে দুইবেলা ঝগড়া করে সকলকে জানাতে লাগলো যে, তারও একটি বৌ আছে তখনো বড়ভাইয়ার শুভবুদ্ধির উদয় হলো না।

হঠাৎ কিছুদিন পর জানা গেল তার এক বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী হবার পর তার নিজেরই এখন বর সাজার ইচ্ছা হয়েছে। রহস্য পরিষ্কার হলে শুনলাম, বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে একটি মেয়েকে তার অতি মনে ধরেছে। সুতরাং তিনি এরিয়েল শ্যারনের মতো বুলডোজার দিয়ে নিজ মাথা থেকে চিরকুমার বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটন করেছেন। খোজ নিয়ে জানা গেল মেয়েটির বাড়ি আমাদের গ্রামের দুই গ্রাম পশ্চিমে। উচ্চ বংশ, মেয়ের পিতা অবস্থা সম্পন্ন কৃষক, মেয়ের নাম ইতি, এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

যথাসময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর এক শুক্রবারে আমি, আব্বা, আম্মা ও আরো কয়েকজন মিলে মেয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। আমাদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়নের সঙ্গে মেয়ে দেখানো হলো। আব্বা–আম্মাও মেয়েটিকে পছন্দ করলেন। কিন্তু হবু ভাবীর ছোটবোনটিকে দেখে আমি চিটপটাং। খাবার টেবিলে মুরগির রোস্টখানা দেখে জিভে পানি আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ার হবু শালিটিকে দেখে হৃদয় ভিজেও প্রেমের স্বাদ পেলাম। মেয়েটি দেখতে অতীব সুন্দরী। নাম শুনলাম ইতু, এবার ক্লাস নাইনে উঠেছে। আমার ষোল বসন্তের এই জীবনে এবার সত্যিকার অর্থেই বসন্তের আবির্ভাব ঘটলো। যাই হোক। জানুয়ারির এগারো তারিখ। শুক্রবারে বিয়ের দিন ঠিক হলো। মাঝখানে এক মাস সময়।

এরই মধ্যে একদিন সময় করে ইতুর বাড়িতে হাজির হলাম। জামাই–এর ছোটভাই বলে আমাকে খুব খাতির করলো ওরা। এরই মধ্যে সময় করে ইতুকে প্রেমের প্রস্তাব দিলাম এবং ওকে রাজি করালাম। এতো ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহৎ বর্ণনা দেয়া গেল না বলে পাঠকরা অনুগ্রহ করে বদদোয়া দেবেন না। তাহলে হয়তো আমার ভাইয়ার ব্রত আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

বিয়ের বাজারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাদের ঢাকাবাসী এক মামার ওপর। তিনি সেখান থেকেই শাড়ি, গহনা, কসমেটিক্স অন্যান্য যা দরকার সবই কিনেছিলেন। দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেল। বড়ভাইয়াকে এবার বরযাত্রী থেকে বর সাজালাম। আটটি মাইক্রোবাসে করে আমরা রওনা দিলাম বেলা বারোটায়। তের কিলোমিটার রাস্তা বলে ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা কনের বাড়ি পৌছে গেলাম। বিয়েবাড়িতে আমার চোখ শুধু ইতুকেই খুজছিল। কিছুক্ষণ পর পেয়ে গেলাম ইতুকে। সে বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ে বসে ছিল। পাঠকরা হয়তো ভাবছেন, *এতো ধান ভানতে শিবের গীত*, লেখাতে শাড়ির কোনো খোজই পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বলছি, আরেকটু ধৈর্য ধরুন। রঙ্গমঞ্চে নটরাজের আবির্ভাব ঘটলো বলে।

যাহোক, চুপচাপ ইতুর পাশে গিয়ে বসলাম।

বললাম, এখানে বসে আছো যে?

ইতু হেসে বললো, সে তো তোমারই জন্য।

দেখলাম ইতু আজ খুব সুন্দর করে সেজেছে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের এক অপ্সরী স্বর্গের ঠিকানা ভুলে মর্তে নেমেছে।

তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এ কথাটা বলেই বুঝলাম খুব শাদামাটা হয়ে গেল। তাই জলদি সামলে নিয়ে বললাম, নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহাকবি কালিদাস খুব সুন্দর একটা কবিতা লিখেছিলেন। সে আদুরে গলায় বললো, শোনাবে না?

চরণটা আমার গলাতেই আটকে গেল। কারণ আমার ঠোট দুটি তখন ইতুর নরম ঠোটের উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে মীরজাফর হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর বিয়ের বাড়িতে পৌছে দেখি বিরাট গোলমাল। যা শুনলাম তাতে আমার গোবরে ঠাসা মগজটা গোবরসহই মাথা থেকে দৌড় দিল। ঘটনাটা হচ্ছে, বৌ সাজানোর জন্য আমরা যে দামি শাড়িটা দিয়েছিলাম তাতে নাকি একটা দেশি আলুর সমান ছিদ্র পাওয়া গেছে। এই কারণে কনেপক্ষের শকুনি মামারা বরপক্ষের ওপর চড়াও হয়েছে। দুইপক্ষের মধ্যে *পানিপথের যুদ্ধের* মতো *বিয়ে পথের যুদ্ধ* বাধার উপক্রম হলো। এবং সকলের টানাটানিতে সেই ছিদ্র দ্রুত হলান্ডের আলুর আকৃতি ধারণ করলো। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হয়। আমার এক ফুপা অতি দ্রুত একটা নতুন দামি শাড়ি কিনে এনে গণ্ডগোল মিটমাট করে দিলেন। পরে শুনেছিলাম তিনি মোটরসাইকেল করে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে দোকান থেকে শাড়িটা কিনে এনেছিলেন। ফুপার এই বিচক্ষণতার কারণে বড়ভাইয়া (সেই সঙ্গে আমি) সেদিন রক্ষা পেয়েছিলেন। নতুন ভাবী নিয়ে ফেরার সময় মনে মনে বললাম, হে শাড়ি, তোমাকে নমস্কার!

নাটোর থেকে

গিফট

–গাজী মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ডলার

১৯৯৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পর ঢাকায় এসেছি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য কোচিং করতে। থাকার জন্য ঢাকার ইব্রাহিমপুরে উঠেছি খালাতো বোনের বাসায়। নিয়মিত কোচিং ও লেখাপড়া করছি যাতে ঢাকায় আসা বৃথা না যায়।

একদিন বিকেলে কোচিং থেকে বাসায় ফিরে দেখি আপার সঙ্গে সুন্দরী এক মহিলা বসে গল্প করছেন। আমার সঙ্গে সেই মহিলার পরিচয় করে দিলেন আপা। জানতে পারলাম তিনি আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। তিনি যখন জানতে পারলেন আমি যশোর থেকে এসেছি তখন সেই মহিলার কাছে আমার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো যশোর স্টিচের শাড়ি। আমার গ্রামের অনেক বাড়িতেই ইনডিয়ান শাড়ির ওপর হাতের কাজ করতে দেখেছি। কিন্তু সেই শাড়ির যে এতো সুনাম তা পাশের ফ্ল্যাটের সেই ভাবীর কাছে থেকেই প্রথম জানতে পারলাম। মনের অজান্তেই আমার গর্ব হতে লাগলো সেই শাড়ির জন্য।

বেশ কিছুদিন পর যশোরে গেলাম বেড়ানোর জন্য। ইতিমধ্যে ভাবীর সঙ্গে অনেকবার গল্প ও আড্ডা হয়েছে। বাড়ি থেকে ঢাকা আসার সময় ভাবীর জন্য একটা সুন্দর দেখে যশোর স্টিচের শাড়ি কিনে আনলাম। ভাবী শাড়ি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত।

তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে সুন্দর একটা গিফট দেবো।

একদিন দুপুর এগারটা কি বারোটার দিকে পড়ছি। আমার আপা–দুলাভাই অফিসে এবং ভাগ্নে দুইজন স্কুলে। এ সময় বাসার কলিংবেল বেজে উঠলো। গেট খুলে দেখি সুন্দর করে সেজে ভাবী দরজায় দাড়িয়ে আছেন। তার পরনে সেই শাড়ি। ভাবীকে দেখে আমি অভিভূত। ভাবী আমাকে তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য বললেন। আমি বিনা বাক্যে তার ফ্ল্যাটে গেলাম। ভাবী তার ফ্ল্যাটের গেট লাগিয়ে দিয়ে বললেন, কেমন লাগছে?

বললাম, অপূর্ব।

ভাবী বললেন, গিফট নেবে না?

বললাম, দিন।

ভাবী আমার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে তার অপূর্ব দুই ঠোট দিয়ে আমাকে দংশন করতে আরম্ভ করলেন।

এরপর যখন বাস্তবে ফিরে এলাম তখন দেখলাম ভাবীর শরীরে আমার দেয়া সেই শাড়ি আর নেই এবং আমি তার শরীরের ওপর নগ্ন অবস্থায় শুয়ে আছি। জানি না, আমার এ অবস্থা কখন হলো।

ভাবী আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন। এরপর আমার কপালে একটা চুমু দিয়ে তিনি বললেন, কেমন গিফট দিলাম?

পরবর্তী দুই বছর মাঝে মধ্যেই আমি এ গিফট পেয়েছি। জানি না আজ আমার সেই ভাবী কোথায়। তবে তার দেয়া সেই গিফটের কথা সব সময় আমার মনে পড়ে।

যশোর থেকে

বৌ খুশি তো সব খুশি

– আবদুল কাদের শামীম

আমাদের বিয়ে হয়েছে সাত বছর হলো। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত যতো শাড়ি কিনে এনেছি কোনোটাই পছন্দ হয়নি নীলার। তার ধারণা, দোকানদার আমাকে ঠকায়, দাম বেশি রাখে, কাপড়ও দেয় পুরনো মডেলের। শাড়ি কিনে কখনো নীলার মন জয় করতে পারিনি। আমি ভাবি নতুন মডেল কোথায় দেখে নীলা। অনেক ভাবনার পর বুঝলাম নীলা রোজ বাচ্চাকে নিয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে যায়। সেখানে দেখা হয় অনেক মহিলাদের সঙ্গে। সেখান থেকে আবিষ্কার করে নতুন মডেল।

আজো বাচ্চাকে কিন্ডারগার্টেন থেকে এনেই আমাকে একটা শাড়ির মডেলের কথা বললো এবং কোন দোকানে শাড়িটি খোজ করলে পাওয়া যাবে বিস্তারিত সব। সে শাড়িটি দেখে এসেছে। ওই শাড়িটা তার চাই। কি আর করা! বৌ খুশি তো সব খুশি। আমি অফিস থেকে ফেরার পথে যে দোকানটায় নীলা খোজ করতে বললো সেই দোকানটায় খোজ করলাম।

দোকানদার বললো, নেই, বিক্রি হয়ে গেছে।

তারপরেও আরো কয়েকটা দোকান খোজ করলাম। কোথাও পেলাম না। বাড়ি ফিরলাম। হাতে কোনো প্যাকেট নেই দেখে নীলা মুখটা গম্ভীর করে রেখেছে।

হঠাৎ করে বললো, দাম বেশি দেখে নিশ্চয়ই আনোনি।

বললাম না, শাড়ি কোনো দোকানে খুজে পেলাম না।

নীলা আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। একটা শাড়ি নিয়ে আমাদের দুজনার মাঝে বিবাদ হবে তা চাই না।

বললাম, তুমিই কাল মার্কেটে যাবে। এই নাও টাকা।

নীলা বললো, হ্যা, আমিই যাবো।

পরদিন নীলা মার্কেটে গেল। ওই শাড়িটাই সে কোন দোকান থেকে জানি কিনে আনলো এবং আমাকে বললো, এই দেখো শাড়ি। তুমি তো খুজেই পাওনি। না খুজেই আমাকে মিথ্যা বলেছো।

খুজেও মিথ্যাবাদী হলাম। কি আর করা! আমি মিথ্যাবাদী হলেও বৌ খুশি তো সব খুশি।

এবার ঘটলো মজার ঘটনা। নতুন শাড়ি পরে বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে গেল। এদিন দেখে, যে মহিলার পরা শাড়ি দেখে নীলা শাড়ি কিনেছিল তিনি আজ অন্য আরেকটা শাড়ি পরে এসেছেন। নীলার পরা শাড়ি দেখে মহিলাটি বললো, ভাবী এই মডেলটি তো অনেক পুরনো। আমি কিনেছিলাম এক বছর আগে। অনেক দিন পরিনি। সেই দিন শাড়িটি পরে স্কুলে আসায় অন্য সব ভাবীরা বললো, সে কি ভাবী আপনি এতো পুরনো মডেলের শাড়ি পরেছেন, আপনাকে একদম ভালো লাগে না। সেই শাড়িটা আমার কাজের বুয়াকে দিয়ে দিয়েছি। আর আজ পরনে যে শাড়িটি দেখছেন এটা কাল কিনেছি। একদম লেটেস্ট নতুন মডেল।

নীলা মহিলার কথা শুনে হতবাক! বাড়ি ফিরে এলো। নীলার মন খারাপ।

বললাম, কি হয়েছে। আজ কোনো নতুন শাড়ির মডেল দেখেছো।

নীলা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেললো। বললো, আমায় তুমি ক্ষমা করো।

বললাম, কি হয়েছে বলো না?

বললো, এতোদিন তোমাকে বলেছি, তুমি ভালো শাড়ি কিনতে পারো না, দোকানদার তোমাকে ঠকায়। আমি কোনো শাড়ির কথা বললে তুমি না খুজেই বলো খুজেছি। তোমায় মিথ্যাবাদী বলেছি। আমার ভুল হয়েছে।

বললাম, তোমার ভুল ভেঙে গেছে, বিবাদও মিটে গেল।

তারপরেও নীলা আমাকে বললো এখন থেকে তুমি আমার শাড়ি কিনে আনবে। তোমার পছন্দই আমার পছন্দ।

আমারও তো ওই একই কথা, বৌ খুশি তো সব খুশি।

জিয়া মার্কেট, ভোলা থেকে

দীপাবলীর রাতে

– মনোজ কুমার দাস

আমার বাবা ও কাকা দুই ভাই। বাবার চাকরির সুবাদে আমরা দীর্ঘ বিশ বছর গাজীপুরে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অফিসার্স কলোনিতে ছিলাম। বাবা সেখানে কর্মরত ছিলেন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যখন তাদের পাওনা বুঝিয়ে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক–এর মাধ্যমে পুরো ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেয়া হয় তখন সবেমাত্র আমি এইচএসসি পাস করে বের হয়েছি ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ থেকে। সালটা ছিল ১৯৯৪। এমন অবস্থায় আমরা আমাদের পৈত্রিক ভিটা ঢাকার সবুজবাগ থানায় দক্ষিণগাও গ্রামে চলে আসি। আগেই বাড়িতে থাকতেন কাকা–কাকি, তার দুই ছেলে শিশির ও শচীন, ঠাকুমা এবং এক স্বামী পরিত্যক্ত পিসি।

আমরা বাড়িতে আসায় এই সদস্য সংখ্যা বেড়ে হলো বারোজন। আমরা দুই ভাই, দুই বোন, বাবা–মা, কাকা–কাকি, তাদের দুই ছেলে, পিসি ও ঠাকুমা এই বারোজন। পৈত্রিক বাড়িতে আমরা এক রকম খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। তবুও আমাদের সংসার ভালোই চলছিল। আমরা ছিলাম আমাদের হিন্দু পাড়ার একমাত্র শিক্ষিত প্রগতিশীল ফ্যামিলি। আমাদের আর্থিক অবস্থা, পড়ালেখা, চলাফেরা সব কিছু ছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা। কাকা টিঅ্যান্ডটি–তে চাকরি করতেন। দাদা করতেন পিডিবি–তে। আমি ডিপ্লোমাসহ গ্র্যাজুয়েশন করে ল' পড়ছি। ছোট বোন ইডেনে পড়ছে। অন্যটির বিয়ে হয়েছে। কাকার ছেলে শিশির থৃ–তে পড়ে। অন্যটি ছোট।

আমাদের এ সকল অবস্থার কারণে অশিক্ষিত পাড়ার লোকজন পদে পদে আমাদের বিপদে ফেলতে লাগলো। সবচেয়ে বেশি বিপদে ফেললো বাবার এক কাকাতো ভাই রঞ্জিত। সম্পর্কে সেও আমাদের কাকা লাগতো। এই রঞ্জিতকাকাকে আমার বাবাই বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিতে টেকনিশিয়ান পদে চাকরি দিয়েছিলেন। একই সময়ে সেই কাকাও গোল্ডেন হ্যান্ডশেক–এর মাধ্যমে পাওনা বুঝে পেয়েছিলেন। এই রঞ্জিতকাকার সঙ্গে আমাদের এজমালি বিভিন্ন সম্পত্তি ছিল। বাড়িতে আসার পর যখন দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল তখন শুরু হলো আমাদের পরিবারের নানান রকম

সমস্যা। ১৯৯৮ সালে ঢাকা মহানগরে জরিপ কাজ শুরু হলে রঞ্জিতকাকা আমাদের সকল পৈত্রিক ও ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে ডিসপিউট দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কেস করলো। ফলাফল পেল না কিছুই। আমাদের আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এরপর যখন কিছুতে পেরে উঠলো না তখন আমাদের বিরুদ্ধে থানায় নানান রকম কৃমিনাল মামলা দিয়ে হয়রানি শুরু করলো। এ রকমই এক সময়ে রঞ্জিতকাকার শাশুড়ি বেড়াতে এলো তার বাড়িতে।

তখন চলছিল কালিপূজা। দীপাবলীর রাতে প্রদীপ জ্বালানো শেষ হলে আমি ও আমার কাকাতো ভাই শিশির শুরু করলাম আতশবাজি ও পটকা ফোটানো। এমন সময় রঞ্জিতকাকার শ্বাশুড়ি অর্থাৎ আমাদের দিদিমা ওঠানে এসে দাড়ালো। আমি পটকা ফোটাচ্ছি আর কাকাতো ভাই শিশিরের ছোড়া জ্বলন্ত তারাবাজির অবশিষ্ট অংশ গিয়ে পড়লো তার শাড়ির ওপর। এতে তার শাড়ি বেশ কয়েক জায়গায় পুড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। দিদিমা আমাদের কিছু বললো না বটে। কিন্তু তার জামাই ও মেয়ে অর্থাৎ রঞ্জিতকাকা এবং কাকি আমাদের ওপর শুরু করলো অকথ্য ভাষার ননস্টপ গালিগালাজ যা এখনো মাঝে মধ্যে শোনা যায়।

সেদিন সেই ঘটনার পর দিদিমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ছিলাম ও বলেছিলাম, যেদিন চাকরি করবো সেদিন আপনার শাড়ি কিনে দেবো। সেদিন সেই ঘটনার পর থেকে আজো আতশবাজি স্পর্শ করিনি। আজ ২০০২ সালে এসেও কোনো চাকরি পাইনি। আর দিদিমার শাড়িও কিনে দেয়া হয়নি। এখন শুধুই ভাবি, আর কতোকাল যে বেকার থাকবো।

দক্ষিণগাও, বাসাবো থেকে

পুটলি

– মুবাশ্বিরা শাহনাজ

আমার বিয়ের শাড়িগুলো খুব সুন্দর। সবগুলোই আমাদের দেশের তৈরি। সব শাড়িগুলোই একটা সুন্দর পুটলিতে বেধে রেখেছি। কারণটা হলো, ঝুলিয়ে রাখলে আমার মনে হয় বিয়ের সুগন্ধটা হালকা হয়ে যাবে। সবার অজান্তে একটা কাজ আমি করে থাকি। সেটা হলো, সেই শাড়ির পুটলিটা মাঝে মধ্যে খুলে দেখি আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই বিয়ের দিনের সুগন্ধটা নাকে এসে লাগে। আরো পাই প্রথম শাড়ির ঘোমটা খুলে মুখ দেখার সময়টির মধুর স্মৃতি।

কাকরাইল, ঢাকা থেকে

প্রশ্ন

– সুভাষচন্দ্র সেন

নাম তার মাধবী। তবে সেই কালবেলার মাধবী লতা নয়। পরিচয় হয় কলকাতার ভিক্টোরিয়া পার্কে। আমার মতো সেও পূজা দেখতে কলকাতা গিয়েছিল। বাড়ি কুমিল্লা।

কলকাতা যতোদিন ছিলাম প্রায় ততোদিনই দুজনের মধ্যে দেখা হতো সেই পার্কে, বিশেষ করে বিকেল বেলা। আসার সময়ও এক সঙ্গে বাংলাদেশে আসি। আমার কার্ড দিলাম। ফোনে আমরা সব

সময় কথা বলি। কিছুদিন যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম সে আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কথার মধ্যে সে রকম কিছু অনুভব করতে লাগলাম।

তাই বললাম, আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। এর বেশি যেন না হয়। এটাতে সে রাজি নয়।

একদিন সে আমার চেম্বারে এসে হাজির। পরনে শাড়ি, হাতে একটা ব্যাগ। আমি দেখে অবাক।

আরে, মাধবীদি আপনি?

কি, চমকালেন বুঝি?

না, না, আপনি যে এভাবে আসবেন ভাবতে পারিনি।

আপনি বাধ্য করলেন এ জন্য এলাম।

বাধ্য করলাম মানে?

দেখুন, কোনো প্রশ্ন করবেন না, আমি যা–ই বলবো তাই–ই করবেন সুবোধ বালকের মতো। আমি সব ঠিকঠাক করে এসেছি। চলুন আজ আমাদের বিয়ে হবে। কোনো কথা শুনতে চাই না। শুনবো না, শোনাতেও চেষ্টা করবেন না।

একেবারে বোকা হয়ে গেলাম। মাধবীদি আপনার মাথা ঠিক আছে তো? আপনি করছেনটা কি!

সে ঘামছে। কিছুক্ষণ পর মোবাইল বেজে উঠলো। ধরলাম, দেখি খুব করুণ কণ্ঠে মিনতি করে বলছে, প্লিজ আপনি তাকে বাচান।

বললাম, আপনি কে এবং কাকে বাচানোর জন্য বলছেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সব কিছু বলবো। আপাতত আপনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বসান, আমি আসছি। বলে লাইন কেটে গেল।

কিছুক্ষণ পর দেখি একটা প্রাইভেট কার এসে চেম্বারের সামনে দাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারার এক ভদ্রলোক এসে সরাসরি চেম্বারে ঢুকে পড়লেন। কি বাবা তুমি এসেছো? ভালোই হয়েছে। বলে মাধবী তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

ভদ্রলোক বললেন, তুই এখানে বস, আমরা একটু আসি। বলে আমাকে বললেন, ডাক্তারবাবু আসুন তো।

গাড়িতে উঠালেন। আগ্রাবাদে এক বিশাল অফিসের সামনে গাড়ি রেখে আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

চা খাওয়ার পর ভদ্রলোক বিস্তারিত খুলে বললেন। তিনি ব্যবসা করেন চট্টগ্রামে। সবাই চট্টগ্রামেই থাকে। এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে ছোট, মাধবী বড়।

ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পর মাধবীকে বিয়ে দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন মাধবীরই পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে। কিন্তু মাধবীকে বিয়ে করবে না বলে সেই ছেলে জানিয়ে দেয়। এরপর থেকে মাধবী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং কোনো পুরুষ দেখলেই ক্ষেপে যায়। এখন তিন বছর হতে চলেছে, কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে কলকাতা থেকে আসার পর শুধু আপনাকে নিয়েই কথা বলে। আপনার পরিচয় ইত্যাদি, সব কিছু জেনে আমরা তো অবাক হয়ে গেছি মেয়ের এ পরিবর্তন দেখে। ঠিকমতো খাওয়া থেকে শুরু করে সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একদিন যখন বললাম, এই ছেলেকে না দেখে না শুনে তোমাকে বিয়ে দেবো কিভাবে? তখন সে কি বলে জানেন? বাবা এই যে শাড়ি

দেখছো? এটা ফ্যানের সঙ্গে লাগিয়ে আত্মহত্যা করবো যদি তার সঙ্গে বিয়ে না দাও। জানি আপনি তাকে বিয়ে করবেন না। কিন্তু আমার মেয়েকে বাচাতে পারবো না। সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বলুন আমি কি করতে পারি!

বলে আমার হাত ধরে তিনি কেদে উঠলেন।

তখন আমি ঘামছি আর কাপছি। তার কান্না থামিয়ে ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে চেম্বারে এলাম। এবং বাবাকে ছাড়া মাধবীকে নিয়ে কিছুক্ষণ একান্ত আলাপ করলাম। যা জানতে পারলাম তা হলো, যে ছেলেটাকে সে ভালোবাসতো তার নাকি ঠিক আমার মতো চাল-চলন, কথাবার্তা ইত্যাদি ছিল। তাই আমার মাঝে নাকি তাকে খুজে পেয়েছে।

সব কিছু বুঝতে পেরে তাকে বললাম, ঠিক আছে তোমাকে অবশ্যই বিয়ে করবো তবে আমার কিছু শর্ত আছে। সেগুলো তোমাকে মানতে হবে। এটা তার বাবার সামনে বললাম।

মাধবী সেটা মেনে নিল।

তাকে স্বাভাবিক করার জন্য একজন বন্ধুর মতো সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছি এবং একদিন তাকে নিয়ে শপিং সেন্টার থেকে চার হাজার সাতশ টাকা দিয়ে তার পছন্দসই একটা শাড়ি কিনে দিয়ে বললাম, ঠিক আজ থেকে চার বছর পর আমাদের বিয়ে হবে এই শাড়ি পরে।

কিন্তু আমি জানি এটা তো মিথ্যা আশ্বাস। যখন চার বছর পূর্ণ হবে তখন আমি কি করবো? মাধবী এখন সুস্থ, স্বাভাবিক তার বাবা মায়ের ভাষায়। মাধবীর মা-বাবার বক্তব্য, কয়েক লাখ টাকা দিয়ে বিদেশে চিকিৎসা করে যা করা সম্ভব হয়নি আমাকে দিয়ে নাকি তা থেকে বহুগুণ উপকৃত হয়েছেন।

কিন্তু নিজের কাছে প্রশ্ন করলে মনে হয়, আমি একজন প্রতারক। সব সময় এই চিন্তায় ভুগছি। আমি কি করতে পারি? আমার বিবেকের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর খুজে পাই না।

চট্টগ্রাম থেকে

বিসর্জন

– মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন খান

আমরা তিন ভাই, তিন বোন। ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় আমি। আমি অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এখন রেজাল্টের অপেক্ষায়। আমার ইমিডিয়েট ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে গত তিন বছর আগে। বাকিরা সবাই পড়াশোনা করছে। মা আছেন পরিবারের কর্তা হিসেবে।

১৯৯১ সাল। তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। তখনো সবচেয়ে ছোট বোনটির জন্ম হয়নি। সংসারে বিভিন্ন টানাপোড়েন চলছিল। বাবার রোজগারে কোনোভাবে কেটে যাচ্ছিল দিন। একদিন হঠাৎ করেই এক অজানা কারণে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন বাবা। আমাদের চারপাশে নেমে আসে হতাশার অন্ধকার। পরিবারের উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তিটির অকাল মৃত্যুতে অভাবও আসতে থাকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় মা হয়ে পড়েন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য।

এদিকে আমার স্কুলে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে টাকার প্রয়োজন। এছাড়া কয়েকটি বই কেনাও জরুরি হয়ে পড়ে। মায়ের কাছে টাকা চাইলে তিনি জানালেন, ঘরে

একটি টাকাও নেই। ঘরে তেমন কিছুও নেই যা বিক্রি করে আমাকে টাকা দিতে পারেন মা। পাড়া-প্রতিবেশী অনেকের কাছে টাকা ধার চাইলাম। অভাবের সংসারে টাকা ধার দিলে আর ফেরত পাওয়া যাবে না এই ভেবে কেউ টাকা দিতে রাজি হয়নি। টাকার জন্য কতো লোকের দ্বারে ঘুরতে দেখেছি মাকে। কিন্তু কেউ মায়ের কথা শোনেনি।

অবশেষে কোনো উপায় না পেয়ে মা তার সবচেয়ে পছন্দের একটি শাড়ি ও একটি রূপার মালা বিক্রি করে দেন। বিক্রি করে দেয়া দুটি জিনিসের মধ্যে শাড়িটি ছিল মায়ের বেশি পছন্দের। খুব যত্ন করে এটা তিনি বক্সে ভরে রাখতেন। কারণ কোনো এক বিয়েবার্ষিকীতে বাবার কাছ থেকে শাড়িটি তিনি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। খুব খারাপ লাগে যখন মনে হয় শুধু আমার জন্যই মা তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি বিসর্জন দিয়েছিলেন।

সময়ের ব্যবধানে আমরা এখন আগের তুলনায় অনেক সচ্ছল। মায়ের একক প্রচেষ্টায় আমাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন আলোর মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পড়ালেখার খরচ যোগাতে মাকে এখন আর শাড়ি বিক্রি করতে হয় না। টাকার জন্য কারো কাছে ধরনা দিতে হয় না। বরং তাদের অনেককেই দেখি টাকার জন্য মায়ের পিছু ঘুরতে যারা মায়ের চরম দুর্দিনেও সামান্যতম সাহায্য করেনি।

প্রায় এক যুগ পেরিয়ে গেলেও সেই ঘটনাকে ভুলতে পারিনি সামান্য সময়ের জন্যও। পিতৃহারা সংসারে অভাবের তাড়নায় অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কেটেছে আমাদের। মা নিজে না খাইয়ে আমাদের খাইয়েছেন। নিজে না পরে আমাদের পরিয়েছেন। অদম্য সাহস আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতাকে তিনি জয় করেছেন। আজো তিনি আমাদের দেখাশোনা করছেন পরম নির্ভরশীলতায়। কিন্তু সেই দুঃসময়ে বাবার দেয়া প্রিয় শাড়িটি মা রক্ষা করতে পারেননি।

ময়মনসিংহ থেকে

রাজা নই

– সোনিয়া শারমিন আকবর

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। সেই কাকডাকা ভোর থেকে শুরু হয়েছে। তবে কিছুটা থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বৃষ্টি ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সে একনাগাড়ে ঝরে যাবে, নাকি সারাদিন ধরে ঝরে মানুষকে পোহাবে। এই বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের মধ্যেও ভেসে আসছে কে যেন গান করছে। ঠিক গান নয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। খুব খেয়াল করে শুনলাম। হ্যা ভৈরবি রাগ। ঘড়ি দেখলাম, নয়টা বাজে। ভৈরবি গাওয়ার সময় এটা নয়। তবু বৃষ্টির দিন বলে ভালো লাগছে। পবিত্র একটি রাগ। শুভ্র শাদা শাড়ির মতো। শাড়ি? মনে হঠাৎ উকি দিল স্কুলের কথা। সেদিন শাড়ি পড়ে স্কুলের এক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার কথা ছিল।

তখন ক্লাস এইটে পড়ি। স্কুলের অনুষ্ঠান। ম্যাডাম বলেছেন *মার্জিত* শাড়ি পরে যেতে। শাড়ির কথাটাই মনে ছিল ভালো মতো। তবে মার্জিত কথাটা উকি দিতে লাগলো মাঝে মধ্যে। ম্যাডাম আমার মায়ের সঙ্গে কথাও বলেছেন, কিভাবে সাজতে হবে। তবু চিন্তা করলাম, প্রথম শাড়ি পরে

বাড়ির বের হবো, এতো কিছু দেখলে কি চলে? রিকশা করে বাসায় যাবার সময় আম্মাকে যখন বার বার জিজ্ঞাসা করছিলাম, কি শাড়ি পরবো আম্মা? তখন হঠাৎই আম্মা বললেন, যা, আমার বিয়ের শাড়িটাই পড়িস। আমি তো মহা খুশি। কম কথা? বিয়ের শাড়ি বলে কথা।

তারপরের ঘটনা মনে পড়লে হাসি না পেলেও অজানা একটা ভালোলাগায় মনটা ভরে যায়। আমার চেনা–জানা সব চাচি, খালা, মামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আর বললাম, আন্টি, ম্যাডাম বলেছেন, মার্জিত শাড়ি পরতে। তাতে কি? তুমি ভালো কয়েকটা শাড়ি পাঠিয়ে দিও। অনুষ্ঠানের তখনো এক সপ্তাহ বাকি। প্রতিদিনই স্বপ্ন দেখতাম। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পেতাম, আমি সিদুর রঙের জমিনের ওপর রূপালি পাড় দেয়া একটা শাড়ি পড়ে ছোট্ট একটা নদীর পাশ দিয়ে শুধু ছুটে বেড়াচ্ছি। চুলগুলো খোলা। দুই হাত ভর্তি লাল চুড়ি, কপালে টিপ, চোখে কাজল। হালকা করে ঠোট রাঙানো। নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হতাম। সেই জগৎটা শুধু আমার ছিল এবং সেই থেকে আমারই আছে। সেই সময় খুব ভালো লাগতো। এখনো ভালো লাগে। মিষ্টি হালকা বাতাস আমার শাড়ির আচল দোলাতো। সঙ্গে আমার চুলও। সেই নদীটার পাশেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। চমৎকার আর অদ্ভুত সুন্দর সেই জগৎটা জুড়ে নীল আকাশ। সবুজের মধ্যে শাদা কাশফুলের বন। ইচ্ছা হলে ছুটে বেড়াতাম সেখানে। সত্যিই চমৎকার ছিল আমার সেই জগৎটা।

অনুষ্ঠানের দুদিন আগেই আমার কাছে এক ডজন শাড়ি চলে এলো মায়ের শাড়িগুলো বাদেই। প্রত্যেকটার সঙ্গে শুধু ম্যাচ করা ব্লাউজই নয় – চুড়ি, মালা, কানের দুল ইত্যাদি সবই ছিল। এখানে একটা কথা না বললেই নয়। আমার বাবা সাংবাদিক ছিলেন। সেই সূত্রে গান–বাজনা, লেখালেখির হাতও ছিল মোটামুটি। তাই সবাই আমাকে একটু বেশিই আদর করতেন। তবে অনেকে এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে নিল। তারা, যারা বাবাকে বার বার চেষ্টা করতো তাকে খুশি করতে সেই রকম একজন আমার অনুষ্ঠানের কথা শুনে নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছিল। সেদিন সেই কচি মনও খুশি হতে পারেনি। কারণ বেশি না হলেও কিছুটা বুঝতাম তারা আমার সৎ বাবাকে কিনতে চাইছে। তাই সেটা ছুয়েও দেখিনি। অন্য সব শাড়িগুলো নেড়ে–চেড়ে গায়ের ওপর চাপিয়ে আয়নার সামনে বিভিন্ন ভঙিমায় দাড়াতাম। তবে ঘটনাটা ঘটলো অনুষ্ঠানের আগের দিন। ঢাকার একটা বেশ নামি স্কুলই ছিল আমার স্কুল। তাই বেশ গর্বও ছিল স্কুলকে নিয়ে। সেই গর্বের স্কুলটাই আমার গর্ব ভেঙে দিল। রিহার্সাল শেষ করে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য আবারও ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করলাম শাড়ির কথা। কিন্তু ম্যাডাম আমার স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে বললেন, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো শারমিন। শোনো মেয়েরা, যারা ক্লাস টেন–এ পড়ে শুধু তারাই শাদা শাড়ি, লাল পাড় পড়বে। অন্যরা শাদা সালোয়ার কামিজ পরবে।

আমার তো মাথায় হাত। হায়, হায়! আমার সব শেষ। মনে আছে, সেদিন সারাটা রাস্তা কাদতে কাদতে এসেছিলাম। আম্মা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ খুবই রাগ হলো। বললাম, তুমি কি বুঝবে? নিজে তো সারাদিন শাড়ি পরে থাকো। আমার মতো জামা পরলে বুঝতে কষ্টটা কোথায়।

বাসায় এসেই আব্বুকে ফোন করলাম। আব্বু আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললেন, ভালোই হয়েছে। শাড়ি পরলে একটুও ভালো লাগবে না, বুড়ি বুড়ি মনে হবে। তাছাড়া অনেক ঝামেলাও নাকি হয় ইত্যাদি।

তাতেও মন ভরেনি। শুধুই কাদলাম। মনে আছে কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বাবা রাত তিনটার দিকে অফিস থেকে এসে আমাকে উঠিয়ে ভাত খাইয়ে দেন।

আমার গানটা ছিল *আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।* গেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু মনে মনে বলেছিলাম, মোটেই আমরা সবাই রাজা নই। সবাই রাজা হলে তো নিজেদের ইচ্ছা মতো শাড়ি পরতে পারতাম। টিচাররাও না করতে পারতেন না। রাজা টিচাররাই।

বাগানবাড়ি, মালিবাগ, ঢাকা থেকে

চিরদিনের স্বপ্ন

– মাসুদ রানা ঈমন

আমার ভালোবাসার মানুষটির নাম আশা, যাকে আমার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। সেও আমাকে অনেক ভালোবাসে। মাঝে মধ্যে মনে হয় তার প্রেমের অস্তিত্ব ছাড়া আমার জীবন বৃথা। তার সঙ্গে আমার প্রেম শুরু হয় ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সাল থেকে। অবশ্য ছোটবেলা থেকেই আমাদের মাঝে চেনা জানা ছিল। তাকে এক নজর দেখার জন্য জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করেছি তাদের বাড়িতে।

আশার সঙ্গে যখন কথা বলতাম তখন প্রায় সময়ই তাকে শাড়ি পরার জন্য বলতাম।

সে বলতো, শাড়ি পরতে আমার ভালো লাগে না।

শাড়ির প্রতি আমি আবার বেশি দুর্বল ছিলাম। কারণ শাড়ি পরলে মেয়েদের বাড়ন্ত যৌবনটা দুষ্টু দৃষ্টি দিয়ে সুন্দর দেখতে পাওয়া যায়। ব্লাউজের পেছন দিয়ে ব্রা দেখতে খুব আকর্ষণীয় লাগে।

হাজার চেষ্টার পরও যখন তাকে শাড়ি পরাতে পারলাম না তখন বললাম আগামীকাল যদি শাড়ি না পরো তাহলে তোমার সঙ্গে আমার অর্ধদিবস হরতাল চলবে।

বেলা একটার সময় গিয়ে দেখি সে শাড়ি পরেনি।

বললো, আমাকে না দেখে তুমি থাকতে পারবে না সেটা আমি ভালোভাবেই জানি।

কোনো উপায় না পেয়ে বললাম, কাল যদি শাড়ি না পরো তাহলে অনশন ধর্মঘট ডাকবো। অর্থাৎ তুমি যতোক্ষণ শাড়ি না পরবে ততোক্ষণ কোনো কিছু খাবো না।

যে কথা সে কাজ। সকালে নাশতা খেলাম দোকানে। আমার ভাবীর সঙ্গে আশার সম্পর্ক ভালো। তাই ভাবীর কাছে সে জেনেছে আমি মন খারাপ করে বাড়ি থেকে নাশতা না খেয়ে চলে গেছি।

দুপুর একটায় একটা লোক এসে আমাকে বললো, আশার মা আমাকে যেতে বলেছে। আমি যখন আশার মাকে খোজার জন্য ঘরে ঢুকলাম তখন পেছনে তাকিয়ে দেখি আমার প্রিয়তমা নীল রঙয়ের শাড়ি পরে আমার সামনে দাড়িয়ে আছে। তাকে তখন কতো সুন্দর দেখাচ্ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম যদি কবি হতাম। মনে মনে বললাম, তুমিই আমার *বনলতা সেন।*

মুখে বললাম, তোমার মা কোথায়।

সে বললো, আগে অনশন ভঙ্গ করো তারপর বলছি। তার চোখ দিয়ে পানি আসছে। আমার মুখে ভাত তুলে দিয়ে সে বললো, আমাকে এতো ভালোবাসো কেন?

বললাম, জীবনের প্রয়োজনে তোমাকে ভালোবাসি। শাড়ি কে পরিয়ে দিয়েছে? দাও আমি পরিয়ে দিই। বলেই শাড়িটা খুলে পরানোর সময় গালে কপালে চুমু দিতে লাগলাম। তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

যদি বৌ সাজো গো

আরো সুন্দর লাগবে গো।

আজ জীবনের প্রয়োজনে তার কাছ থেকে আমি অনেক দূরে। কিন্তু আমার মন–প্রাণ পড়ে থাকে সারাক্ষণ তার কাছে। তাকে ছাড়া জীবন অচল মনে হয়। সিঙ্গাপুরের চাকচিক্যময় জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াইনি শুধু একটি স্বপ্ন পূরণের জন্য। আর সে স্বপ্ন হচ্ছে তাকে লাল বেনারসি শাড়ি পরিয়ে চিরদিনের জন্য বুকের পাজরে জড়িয়ে রাখবো।

সিঙ্গাপুর থেকে

মাস্টারআপা

যাকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন তিনি আমার সম্পর্কে কাজিন। বয়সে আমার চেয়ে চার পাচ বছরে বড়। সঙ্গত কারণেই তাকে আপা বলে ডাকি। এখনো অবিবাহিতা। তিনি আমাদের গ্রামেরই এক ঐতিহ্যবাহী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। উপজেলা শহরে তার বাড়ি। প্রতিদিন আট কিলোমিটার পথ রিকশা–ভ্যানে চেপে তাকে স্কুলে আসতে হয়। আমাদের বাড়িতেও মাঝে মধ্যে থাকেন।

চাকরি পেলে মানুষের যা অবস্থা হয়। পঞ্চাশটিরও বেশি শাড়ি তার। প্রতিদিন আলাদা শাড়ি পরে স্কুলে আসা–যাওয়া। নিত্যনতুন শাড়িতে তাকে অপূর্ব লাগতো। তার পথ পানে তাকিয়ে থাকতো অসংখ্য আতেল। তাদেরই একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার পর থেকে বিকেলে চা খাওয়ার জন্য বাবার কাছে টাকা চাইতে হতো না। আপাকেও এই আতেলের কথা বলতাম আর খুব মজা করতাম দুজনে। এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর আমি আপার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লাম। আপার অবস্থাও যে প্রায় একই তা বুঝতে পারলাম।

এ পর্যন্ত আমার প্রত্যেকটা পছন্দই বন্ধু মহলে প্রশংসা পেয়েছে। আপা দেখতে তেমন সুন্দরী না। বলে রাখা ভালো প্রথমে তার সব কিছুকেই ভালোবেসে ফেলিনি। আগে তার কোনো একটা দিক আমার ভালো লেগেছে। একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করার মতো যে, কোনো মানুষের কোনো একটা বিশেষ দিক ভালোলাগার সঙ্গে সঙ্গেই ওই মানুষটা আমাদের কাছে কিছুটা বড় হয়ে ওঠে। আপার শাড়িগুলো ছিল অপূর্ব। ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা। তার সব কিছুই এখন আমার ভালো লাগে। আমার জীবনে তিনি ছিলেন দশজন মানুষের একজন। তিনি হঠাৎ একাদশ হয়ে উঠলেন। আমার জীবনের একান্ত মুহূর্তগুলোকে তিনি খুশির হাওয়ায় ভরিয়ে তুলতে শুরু করলেন।

এমনি একটি মুহূর্তে ১ অক্টোবর ২০০১ সাল। তিনি পোলিং অফিসার হিসেবে একটি ভোট কেন্দ্রে নিয়োজিত ছিলেন। তাকে ওই কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া–আসার দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হলো। তার কেন্দ্রের ফলাফল বের হতে দেরি হওয়ায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ভীষণ উৎকণ্ঠায় বাইরে

অপেক্ষা করছি। বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে আমার কাঙ্ক্ষিত প্রিয় মাস্টারআপা কেন্দ্র হতে বেরিয়ে এলেন। তাকে পেয়ে নির্বাচনের কথা ভুলে গেলাম।

ততোক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ না দেখে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম দুজনে। পথে কোনো রিকশা–ভ্যান না পেয়ে হাটতে শুরু করলাম। মাটির রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পড়েছিল। চারদিকে নিস্তব্ধতা। কোনো জনমানুষের সাড়া–শব্দ নেই। মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। দুজনে পথ চলছি একে অপরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে। আকাশে মেঘের আড়ালে চাদ ঢেকে যাচ্ছে আবার উকি দিয়ে জ্যোৎস্না বিলাচ্ছে মধুর স্নিগ্ধতায়। হঠাৎ দুজনে দাড়িয়ে গেলাম। হৃদয়ের গভীরে নাড়া দিয়ে গেল প্রচণ্ড প্রেমময় আবেগ। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। এই প্রথম আমার ঠোট দুটো কোনো নারীর ঠোটের দিকে ছুটে গেল প্রচণ্ড আবেগে। আমার অস্তিত্বে, অনুভবে তাকে একান্ত করে পেলাম।

বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। আকাশে পাণ্ডুর চাদ বিবর্ণ ছায়া ফেললো। প্রকৃতির বুক নীরস ধূসরতায় আচ্ছন্ন হলো। রাতের বুকে স্তব্ধতা। বৃষ্টি থেমে গেছে। দূরে কোথাও ঝি ঝি পোকার ডাকের ক্ষীণ রেশ ক্ষণে ক্ষণে শুভ্র জ্যোৎস্নার বুকে ঢেউ তুলছে। গোল চাদ আকাশে হালকা মেঘের পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাতে জেগে আকি দুজনে কি এক মধুর মূরতি নিয়ে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি দুজনে। অন্তর অনুভবে মধুর ছোয়া হৃদয়কে করে তুললো পুলকিত। শোভাময়ী এ রাত আমার দুই চোখে মোহন স্বপ্নের অঞ্জন পরিয়ে দিল।

রাত সাড়ে আটটায় বাড়িতে ফিরলাম দুজনে। ভেজা শার্ট খুলতে গিয়ে দেখি আমার শাদা গেঞ্জিটা লাল হয়ে গেছে তার শাড়ির ছোয়ায়। সেদিনের স্মৃতিটা মুছে যাবে ভেবে আজো পানিতে ধুইনি গেঞ্জিটা। তার খুব সর্দি লেগেছিল বৃষ্টিতে ভিজে। হিস্টাসিন জাতীয় ওষুধ এনে দিয়ে বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রেগে বললেন, সবই তো তোমার জন্য।

আরো একদিনের কথা। রিকশা–ভ্যানে চড়েছিলাম দুজনে। তার দিকে তাকিয়েছিলাম অপলক দৃষ্টিতে। তিনিও তাকিয়েছিলেন এমনিভাবে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে এক রিকশাচালক চিৎকার দিয়ে বলছে আপামণি আপনার শাড়ি... ।ততোক্ষণে শাড়ির আচল ভ্যানের চাকায় বিধে গেছে।

ছেড়া শাড়ি পরা অবস্থায় তিনি খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললাম দারুণ মানিয়েছে।

রেগে গিয়ে বললেন, তোমার জন্যই তো।

গত ঈদুল ফিতরে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি। সঙ্গে অনেক আত্মীয়। শোবার জায়গা সংকুলান না হওয়াতে তিনি দুজন পিচ্চি কাজিনসহ আমার বেডেই শুয়েছিলেন। আমি শুয়েছিলাম সোফায়। গভীর রাতে তার কাছে গেলাম। ভীষণ শীত পড়েছিল। তার গায়ের লেপ দিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন তিনি। তারপর কতো কি...। আমার মায়ের শাড়ি পরেছিলেন সেই রাতে। ভোর হলে বললাম, শাড়িটা ভালো করে পরে নিন ম্যাডাম।

রেগে বললেন, তোমার জন্যই তো।

আজ তার অভাব হৃদয়ে বড় বেশি করে বাজে। বেদনা আর উপেক্ষায় নীল হয়ে যাওয়া একাকী আমি পাখির মতো উড়ে বেড়াই। দুঃখ এখন আমার নিত্যসঙ্গী। দুঃখটা দিনের বেলায় আমার হাত ধরে

বেড়ায়। রাতে এসে আলিঙ্গন করে। নির্ঘুম রাতে সেই ফেলে আসা স্মৃতির পালকগুলো স্বর্ণালী সাজে সাজানোর অদম্য স্পৃহা বুকের ভেতর তোলপাড় করে। কিন্তু তা কখনো হবে না। কারণ সমাজে এটা অগ্রহণীয়, বাস্তবে অসম্ভব।

আজ খুব করে মনে পড়ছে তার একটি কথা। তিনি প্রায়ই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তোমার জন্যই তো।

সত্যিই কি আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন সেই দিনটি পর্যন্ত যেদিন আমি প্রতিষ্ঠিত হবো?

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

গঞ্জনা

– রাত্রি

অনেক দিন আগের কথা। চারদিক থেকে আমার বিয়ের জন্য প্রস্তাব আসছিল। কিন্তু সবদিক থেকে মিলছিল না। তাই একটার পর একটা দেখেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে একটা বিয়ের অফার এলো। আমার বাবা মায়ের পছন্দ হয়ে গেল। তারপর এনগেজমেন্ট, তার কিছুদিন পর বিয়ে। সব কিছুই কেমন যেন বিদ্যুৎবেগে ছুটছিল। আমাদের পক্ষ থেকে শুধু ছেলের জন্যই জিনিস কেনা হয়েছিল।

আমার বাবা একজন সৎ মানুষ। অতো অল্প সময়ের মধ্যে বিয়ের খরচ সামলিয়ে আমার জন্য কিছু কেনার সামর্থ বা চিন্তা কোনোটাই তার ছিল না। তার ওপর বিয়েটা ছিল একটু অস্বাভাবিক রকমের। যাহোক, আগের দিন ছেলের মা জানালেন তাদের পরিবারে বিয়ে পড়ানোর সময় মেয়েদের শাড়ি পরে বিয়ে পড়ানোর নিয়ম। এ কথা শুনে আমরা সবাই অবাক। এমন কথা তো কখনো কেউ শুনিনি। সেই মুহূর্তে আমার বাবার পক্ষে আমার জন্য বিয়ের শাড়ি কেনাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর লুকিয়ে ঠিকই বিয়ের শাড়ি কিনে দিয়েছিল। সেই শাড়ি পরে বিয়েও হলো।

বিয়ের দিন আমার শাড়ি দেখে আমার শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করেছিল, এই শাড়ি কে কিনেছে।

আমি সরল মনে সত্য কথাটাই বলেছিলাম যেটা আমার জীবনে চরম কাল হয়ে উঠলো। বিয়ের পর আমাকে শাশুড়ির কাছ থেকে বার বার কথা শুনতে হচ্ছে। তিনি বলেন, তোমার বাবা–মা তোমাকে একটা লাল শাড়ি কিনে দিতে পারলো না, তার আবার এতো কথা কিসের। যে ভদ্রমহিলাকে আমি এতো শ্রদ্ধা করি, যিনি কি না আমার স্বামীর মা, তার মুখে যখন এসব কথা শুনি তখন শ্রদ্ধা কোথায় হারিয়ে যায়। তবুও তাকে ক্ষমা করে দিই।

আমার এ কষ্টের কথা কাউকেই বলতে পারি না। শুধু নীরবে চোখের জল ফেলে যাই। মনে হয় আজ আমার বাবা সৎ হওয়ার জন্যই তো আমাকে তাদের চাহিদা মতো শাড়ি কিনে দিতে পারেনি। যদি কালো টাকার পাহাড় থাকতো তাহলে হয়তো তাদের মুখ কালো টাকা দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারতো।

সানাড়পাড়, নারায়ণগঞ্জ থেকে

শঙ্কিত

– তুহিন

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মায়েরাই তাদের বিয়েতে পাওয়া প্রধান শাড়িটা কয়েকদিন ব্যবহারের পর ধুয়ে ইস্ত্রি করে পরম যত্নে রেখে দেন এই ইচ্ছাতে যে, তাদের প্রথম সন্তানের তা হোক ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে এটা উপহার দেবেন। এ রকমই বাসনাতে আমার মা সেই পঞ্চাশ বছর আগে বাবার গার্ডিয়ানদের পক্ষ থেকে দেয়া পছন্দের সবুজ শাড়িটা রেক্সিনে মোড়ানো হালকা একটি কাঠের বাক্সে ভরে সযত্নে ওটা রেখে দেন কাচা ঘরের মেঝেতে। শাড়িটির সঙ্গে একটি আয়না এবং উভয় পাশে দাতওয়ালা কাঠের একটি চিরুনিও ছিল। এগুলোই বিয়ের স্মৃতি বহন করতো।

পর পর দুই সন্তান জন্ম দিয়েও ধরে রাখতে না পেরে সন্তান পিয়াসী আমার অসুস্থ মা শাশুড়ি–ননদের মুখ থেকে রাক্ষসী, অলক্ষুণে ইত্যকার উপাধি পেয়ে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করে বিভিন্ন কবিরাজের পড়াপানি, লতা–পাতার ওষুধ খেয়ে, হুজুরের ঝাড়–ফুক দেয়া, অসংখ্য তাবিজ গলায় ও কোমরে ধারণ করে বিধাতার কাছে কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করে অবশেষে আমাকে গর্ভে ধারণ করলেন। এক সঙ্কটময় মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হলাম। চরম দুর্যোগের মাঝেও আমাকে পেয়ে মা বাবা যেন আকাশের চাদ হাতে পেলেন। পরিবারের সবার কাছে মা হয়ে উঠলেন প্রিয় পাত্রী। সংসারে যেন খুশির বন্যা নেমে এলো।

তিন মাস পর স্বাধীন দেশের আলো বাতাসে এ কোল সে কোল থেকে সকলের পরম মমতায় বেড়ে উঠছি।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিয়ে যখন চারপাশ সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই মাঝে মধ্যে মা বাক্সটা খুলে আমাকে শাড়িটা দেখাতেন আর স্বর্গসুখের হাসিতে বলতেন, আমার বিয়েতে ওটা নববধূকে পরিয়ে ঘরে তুলবেন। মায়ের সেই হাসিতে আমিও যোগ দিতাম। হাতে ধরে শাড়ি, আয়না, ভালোভাবে দেখতাম।

এভাবে কিছু দিন পর পর মা বাক্সটা খুলে দেখতেন জিনিসগুলো অক্ষত আছে কি না। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে কেনা নানান রঙের আরো সাতটি প্রিয় শাড়ি তুলে রাখেন একই সঙ্গে। উদ্দেশ্য একটাই। পুত্রবধূকে উপহার দেবেন। বেড়াতে গেলেও এগুলো কোনো দিন পরতে দেখিনি। জমিয়ে রাখাতেই যেন ওনার পরম আনন্দ। কিন্তু এ হাসি, আনন্দ, সুখ আমার মায়ের জীবনে স্থায়ী হয়নি।

১৯৮৬ সালে মা গেলেন খালাম্মার বাড়িতে বেড়াতে। সঙ্গে আমার একমাত্র ছোটভাইটিও। সংসারে কেবল বাবা আর আমি। বাবা সারাদিন ব্যবসা নিয়ে বাজারে ব্যস্ত থাকেন, আমি পড়ালেখাতে মশগুল। পাশের গ্রাম থেকে আমার একমাত্র ফুপু প্রতিদিন দুপুরে এসে রান্না করে দিয়ে আবার চলে যেতেন। বাক্সটির দিকে কারোরই খেয়াল নেই।

সে যাত্রায় বেশ কিছুদিন বেড়িয়ে এক বিকেলে এসে প্রথমেই দৃষ্টি দিলেন বাক্সটার দিকে। উপরে ধূলাবালি পড়ে আছে। পুরনো কাপড়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করলেন। অনেক দিন কাপড়গুলো দেখা হয়নি। তাই এবার খোলার পালা। বাক্সটা খুলতেই চোখ চড়ক গাছ। দুই চোখ থেকে যেন হঠাৎ অগ্নিবৃষ্টি শুরু হলো। শাড়িগুলোতে হাত রেখেই *সব শেষ হয়ে গেছে* বলে মা গগনবিদারী চিৎকারে

মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু বুঝতে না পেরে কাছে গিয়ে দেখি সর্বনাশ! উইপোকা ঢুকে বাসা বেধে আটটি শাড়িই খেয়ে ফেলেছে।

অপলক চোখে কিছুক্ষণ বাক্সটার দিকে তাকিয়ে ভাবনার মহাসাগরের অতল গহ্বরে যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মায়ের সমস্ত আশা–আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তে মাঝে যেন ধূলায় মিশে বিলীন হয়ে গেল। দ্বিধা–দ্বন্দ্বে ভুগছি এটা আমার ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের অশুভ সঙ্কেত কি না? কাচা মনে হাজারো নেতিবাচক প্রশ্ন উকি–ঝুকি দিল।

অজানা ভয়ে ভীত হয়ে নির্বাক তাকিয়ে আছি বাক্সটার দিকে। মায়ের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছি। স্মৃতি বিজড়িত শাড়িগুলো উইপোকার খাবারে পরিণত হয়ে মায়ের সাধ–আহ্লাদ সব শেষ করে দিল। সেই সঙ্গে আমারও। মায়ের কষ্টে পড়শিরা এসে বেশ কিছুক্ষণ বুঝিয়ে শান্ত করলেন। ততোক্ষণে আমার দুই চোখ বেয়ে ঝর ঝর অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমার এ অবস্থাতে মা তার দুই হাতে ধরে আচমকা আমাকে টেনে বুকে জড়িয়ে আবার সে কি কান্না। উভয়ের চোখের জলে মায়ের বুক আর আমার পিঠ ভিজে একাকার।

এ পর্ব শেষে বাক্সে হাত দিয়ে দেখি নিচের কাঠগুলো খসে পড়ছে। আয়না ও চিরুনি দুটো সঙ্গীদেরকে হারিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের পানে চেয়ে আছে। কাপড়ের টুকরাগুলো মা বার বার উল্টে–পাল্টে, নেড়েচেড়ে দেখেছেন এবং চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। শাড়িগুলো এমনভাবে কেটেছে যে, কাথা সেলাইয়েরও যোগ্য নেই। অগত্যা কি আর করা? ফেলেই দিতে হলো। তিলে তিলে জমানো শখের শাড়িগুলো হারিয়ে মা যেন বেশ কিছুদিন পাথরের মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিলেন। আয়না চিরুনিগুলোও ব্যবহার হতে হতে এক সময় ভেঙে হারিয়ে গেল। মা বিধবা হলেন।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ মায়ের শত পীড়াপীড়িতেও বিয়ে করিনি দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারবো কি না এ আশঙ্কাতে আজো একাই আছি।

আলগী, নরসিংদী থেকে

বদল

– সাহাব উদ্দিন আহম্মেদ

দেখতে আমি খারাপ না। হালকা–পাতলা গড়ন ও ফর্শা, নাক, কান, ঠোট, বিশেষ করে শরীরের গড়ন দেখে সবাই সুন্দরই বলে। তখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। থাকি খালার বাসায়।

একদিন এক দূরসম্পর্কের খালাতো বোন লাকী, আখি ও রিতা বেড়াতে আসে। সেদিন রাতে হঠাৎ তাদের মাথায় নেশা চাপে যে, ওরা আমাকে মেয়ে সাজাবে। আমার কোনো আপত্তিই শুনলো না। যেই কথা সেই কাজ। শুরু হলো তাদের আয়োজন। মনের মাধুরী মিশিয়ে ওরা আমাকে সাজাতে লাগলো। যেখানে যা দরকার সেখানে তাই দিল। লিপস্টিক, পাউডার, টিপ, ব্যান্ডসহ সবই পরানো হলো। সঙ্গে রঙ–রসের কথা ও মিষ্টি হাসি সবার মুখে। আমি শুধু পুতুলের মতো বসেই থাকলাম।

পরিশেষে এলো শাড়ি পরানোর পালা। কোন শাড়িটা পরানো হবে তা নিয়ে শুরু হলো বিতর্ক। প্রথমে একটা পরানো হলো। লাকী বলছে, ভালো লাগছে না। অন্য আরেকটা পরানো হলো। লাকী বলছে, ভালো লাগছে না। অন্য আরেকটা পরানো হলো।

না, না এটাও না। শেষে তৃতীয় শাড়িটি ঠিক হলো। শাড়ি পরা আমাকে আয়নার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। একি কাণ্ড! এতো নিপুণভাবে সাজানো হয়েছে অন্যরা তো চিনতেই পারেনি। নিজেকেই চিনতে পারছি না আমি কি সত্যিই মেয়ে না ছেলে? বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়ে দেখতে হয়েছে।

সময়ের বিবর্তনে দুই বছর পর সেই লাকীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। শুরু হয় নতুন জীবন। কিনতে হয় নতুন শাড়ি। সুন্দর মনের লাকীর পছন্দও সুন্দর। তবে পছন্দটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শাড়ি কিনে আনলে এটা এই রকম। রঙ ভালো না মানে বদলাতে হবে।

উপহারের শাড়িও বদলানো হয়েছে। এই তো গত ঈদে শাড়ি কিনবো। লাকীকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। সঙ্গে শ্যালিকা আখিও ছিল। নিউ মার্কেটের প্রতিটি শাড়ির দোকান দেখে অবশেষে শাড়ি পছন্দ হয়েছে এবং এটাই কিনে নিয়ে এলাম। তখন নিজেকে অনেক হালকা লাগছিল। যাক, এবার আর সমস্যা হবে না। যখনই বাড়ি গেলাম একজন বললো, শাড়ির কালারটা কেমন জানি...।

আনন্দ আর বেশিক্ষণ টিকলো না। এসে বলছে, শাড়ি বদলাতে হবে। তখন কি রকম লাগতে পারে আপনারাই বলুন। সেদিন থেকে বুঝতে পারছি কেন আমাকে তিনটি শাড়ি পরানো হয়েছিল। আর মনে হচ্ছিল ইটিভি যেমন পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ তেমন আমার স্ত্রী শাড়ি বদলাতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

শেখ হাসিনা যেমন দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তেমন আমার স্ত্রী শাড়ি বদলানোর প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবে এ কথা হলফ করে বলতে পারি। খুব ভয়ের মধ্যে আছি, কেউ যদি বলে, তোর স্বামীটা সুন্দর না, সেদিন না আমাকে বদলানোর অঙ্গীকার করে বসে!

ভাকুর্ত্তা, সাভার ঢাকা থেকে

ব্যালান্স

– বেলাল খান

মে মাসের প্রচণ্ড গরম। স্নান সেরে লুঙ্গি পেলাম না। মা দিলেন তার শাড়ি পরতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপায়ান্তর না দেখে লুঙ্গির মতো করে শাড়ি পরলাম। দুপুরের খাবার শেষ করে ঘামে ভেজা শরীর মুছতে মুছতে বিছানায় গেলাম। লোডশেডিং। পাখার সুইচ অন করে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর বিদ্যুৎ এলো। পাখা ঘুরছে। পাখার বাতাস ঘর্মাক্ত শরীরে ঠাণ্ডা পরশ ছড়িয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো মাগরিবের নামাজের একটু আগে। ঘুম ভেঙে আমার বেহাল অবস্থা দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক। শুয়ে ছিলাম চিৎ হয়ে। পাখার এলোমেলো বাতাসে লুঙ্গির বিকল্প শাড়ি আমার শরীরের অত্যাবশ্যকীয় জায়গায় ছিল না। আমার কোমরের নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। সংবিৎ ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে শাড়ি দিয়ে জড়িয়ে আব্রু রক্ষা করলাম। আমার বেহাল অবস্থা কেউ দেখেছে কি না জানি না। কিছুটা সঙ্কোচ নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। কেউ নেই। মায়ের ঘরে উকি

দিলাম। মাগরিবের নামাজের জন্য মা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চাপকলে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে লুঙ্গি পরলাম।

সপ্তাহ খানেক পার হয়েছে। ভুলে গেছি সেদিনের ঘটনা। যতোদূর মনে পড়ে বুধবার দুপুর। গরমে ঘামছি আর পাটি গণিতের লাভ–ক্ষতি কষছি। হঠাৎ পাশের বাড়ির সুন্দরী যুবতী উমাভাবী সামনে এসে কাশি দিয়ে তার উপস্থিতি ঘোষণা করলেন। মুখ তুলে দেখি ভাবীর মুখে দুষ্টুমির হাসি। অংকের মোট মূলধন বের করে লাভ নির্ণয়ের নিমিত্তে খাতায় কলম রেখে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছো কেন ভাবী?

কারণ আছে।

কি কারণ?

শুনতে চাও?

বলো।

লজ্জা পাবে না তো?

লজ্জা পাবো!

পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

খুলে বলো।

অংকে লাভ নির্ণয় করা বন্ধ রেখে ভাবীর মুখের দিকে তাকালাম।

পাচ ছয় দিন আগে এক দুপুরে বাবাকে চিঠি লেখার জন্য তোমার রুমে কলম নিতে এসে তোমার অবস্থা দেখে ভীষণ বিব্রত হয়েছিলাম। চাচির শাড়ি পরে তুমি ঘুমাচ্ছিলে...।

সব মনে পড়ে গেল। লজ্জা পেয়ে মুখ নামালাম। ভাবী শব্দ করে হাসছেন।

হাসি থামিয়ে ভাবী বললেন, লজ্জা পেলে?

এটা তোমার অন্যায় ভাবী।

কোনটা?

যা দেখেছো, দেখেছোই। তাই বলে এখন আমাকে শুধু লজ্জা দিচ্ছো কেন?

বারে, আমার একটা দায়িত্ব আছে না?

দায়িত্ব!

হ্যা, দায়িত্ব।

কি রকম?

ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ তোমার ইজ্জত দেখে ভয় না পায় সে বিষয়ে সতর্ক করা।

তুমি ভয় পেয়েছিলে?

ভয় না পেয়ে উপায় ছিল? যা ভয়ঙ্কর তোমার অস্ত্র। আবার দুষ্টুমি ভরা হাসি, চোখের টিপ্পনি।

কোথা থেকে সাহস পেলাম জানি না। ভাবীকে বললাম, একটা ব্যালান্স করা যায়।

ভাবী চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যালান্স!

ইয়েস ম্যাডাম, ব্যালান্স।

সেটা কি রকম।

লজ্জা পাবে না তো?
দুষ্টুমি হচ্ছে?
কিছুটা।
ভাবী মুখে গাম্ভীর্য এনে আদেশের সুরে বললেন, তোমার ব্যালান্স তত্ত্বটা কি?
ভয়ে ভয়ে বললাম, তুমি আমার ইজ্জত দেখেছো, এখন তোমারটা একটু দেখিয়ে দাও।
অসভ্য কোথাকার, বলে আমাকে মারার উদ্দেশে ভাবী চড় ওঠালেন।
মুখ বাড়িয়ে দিলাম। বাম গালে মৃদু আঘাতের চড় মারলেন। মুখ তুলে তাকালাম ভাবীর দিকে। দুই হাতে আমার মুখ ধরে ভাবী নিজের মুখ নামিয়ে এনে আমার মুখের চড় মারার স্থানে ঠোট রাখলেন। স্বাভাবিক ভাবনায় ছেদ পড়লো। ভাবীর শরীরের গন্ধে মাতোয়ারা হলাম। ভাবীর ম্যারাথন চুমু শেষ হতে চায় না। দুই হাতে ভাবীর মুখ ধরে চোখে চোখ রাখলাম। সব দ্বিধা উবে গেল। ভাবীর সরু গোলাপি ঠোট পুরে নিলাম নিজের মুখে। সব সুধা চুষে নেবো আজ। ভাবী কামনায় ছটফট করছেন। এর মধ্যে হাতে চলে গেছে ভাবীর বুকে টুইন টাওয়ারে। এক সময় ভাবী তার শরীরের সব ভার আমার ওপর ছেড়ে নিজে ভারমুক্ত হলেন। আর তর সইলো না। দুজনে এলিয়ে পড়লাম বিছানায়। শুরু হলো ব্যালান্স করা।

সপুরা, রাজশাহী থেকে

আব্বার চোখে

– গিনি

আব্বার চোখে আমরা বোনরা এখনো যেন সেই ছোট্টটি হয়ে রয়েছি। তাই আব্বা কখনোই আমাদের শাড়ি পরাটা পছন্দ করেন না। এ জন্য শাড়ি কিনেও দেন না। আপার বিয়ে হয়েছে। তবুও আপাকে শাড়ির চেয়ে সালোয়ার কামিজই আব্বা বেশি কিনে দেন। আমি এইচএসসি পাস করার পর আপার বিয়ে হয়। আপা বিয়ের ফিরানি করতে তার ননদকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। আপার বিদায়ের দিন আপা ও তার ননদের জন্য শাড়ি নিয়ে আসেন আব্বা।
কিন্তু আপার ননদ বেকে বসলেন। শাহিনআপা অর্থাৎ আপার ননদ বললেন যে, চাচা, গিনিকে শাড়ি দিলে আমি নেবো, না হলে নেবো না।
আব্বা বললেন, সে তো শাড়ি পরার মতো বড় হয়নি। তাকে আবার শাড়ি কিনে দেবো কেন?
শাহিনআপা কিছুতেই রাজি হলেন না।
শেষে আব্বা মানতে বাধ্য হলেন। আর আমাদের তিনজনের জন্য খুব দামি তিনটি শাড়ি নিয়ে এলেন। আমার শাড়িটি খুবই সুন্দর যা কি না আমার জীবনের প্রথম শাড়ি।
তবে শাড়িটি এখনো পরা হয়ে ওঠেনি। কারণ আব্বার চোখে ততোটা বড় হতে পারেনি যতোটা বড় হলে শাড়ি পরা যায়। আমি এখন অনার্স থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। শাড়িটি নতুন অবস্থাতেই ভাজ করে রাখা আছে। ভেবেছি, আব্বার চোখে যেদিন সত্যিই বড় হতে পারবো, সেদিন জীবনের প্রথম শাড়িটি পরে আব্বাকে সালাম করবো।

রাজশাহী থেকে

দান

– উম্মে হাবিবা

তখন ক্লাস টেনে পড়ি। আমার বান্ধবীদের প্রায় সবারই শাড়ি ছিল। তারা সব সময় শাড়ির গল্প করতো। তখন মনে মনে ভাবতাম, ইশ! আমার যদি একটা শাড়ি থাকতো!

একদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে কান্না জুড়ে দিলাম আমাকে শাড়ি কিনে দিতে হবে। আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। তখন আব্বার কাছে টাকা ছিল না।

তাই আব্বা বললেন, ঠিক আছে যখন টাকা হয় তখন কিনে দেবো।

আমি জেদ ধরলাম, আজই কিনে দিতে হবে।

আব্বা কোনো উপায় না পেয়ে আমার দাদির ওষুধ কেনার টাকা আমাকে দিলেন শাড়ি কেনার জন্য। বিকেলে মার্কেটে গিয়ে নীল রঙের একটা শাড়ি কিনে আনলাম। শাড়িটা আমার এতো প্রিয় ছিল যে, কাউকে ধরতে দিতাম না, এমনকি আমার বোনকেও না।

একদিন আমার বোন শাড়িটা ধরেছিল বলে তার সঙ্গে পুরো এক দিন কথা বলিনি। আমাদের বাড়িতে কাজ করতো একটা মহিলা। তার মেয়ে মদিনার বিয়ে। মদিনাদের অবস্থা খুব করুণ। মদিনার মা আমাকে ধরে কান্নাকাটি করলো মেয়েকে একটা শাড়ি দিতে পারবে না বলে। মদিনার মায়ের কান্না দেখে আমার শাড়িটা দিয়ে দিলাম। যে শাড়িটা ছিল আমার জীবনের চেয়ে প্রিয় সেই শাড়ি দিয়ে দিলাম অন্যকে। তবু আমার খারাপ লাগেনি। বরং ভালো লেগেছে। সেই প্রথম আমি বুঝলাম কাউকে কিছু দিতে পারলে তা কতো সুখের, কতো আনন্দের।

টাঙ্গাইল থেকে

পরীক্ষার আগে

– সজীব

১৩ এপ্রিল ২০০০ সাল। আমি তখন ঢাকা কলেজের একজন পরীক্ষার্থী। এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। চোদ্দ ও পনেরো তারিখ পর পর দুটি রসায়ন ফাইনাল মডেল টেস্ট। অথচ পদার্থ ও গণিতে সময় দিতে গিয়ে রসায়নের যে কি বেহাল অবস্থা তা একমাত্র আমিই জানি।

দুপুরবেলা বসে পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। হঠাৎ আম্মু এসে বললেন, ছোটবোন নরীন কাল স্কুলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে নাচবে। তাই নতুন শাড়ি কিনতে হবে। মায়ের অনুরোধে এবং ছোটবোনের কান্নাকাটিতে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটা বাধ্য হয়ে শার্ট–প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম। লক্ষ্য পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো। কিন্তু যানজটের কারণে পৌছাতেই চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। আম্মু সাইফুলভাইয়ের দোকানে আগেই ফোন করে রেখেছিলেন। চাদনি চক মার্কেটে সাইফুলভাইয়ের দোকানে পৌছেই এক নিঃশ্বাসে বললাম, সাইফুলভাই কেমন আছেন? আম্মু শাড়ি দিতে বলেছেন, তাড়াতাড়ি দেন।

তিনি বললেন, আরে ব্যস্ত হচ্ছো কেন? বসো, ঠাণ্ডা হও, তারপর না হয় শাড়ি নেবে।
বললাম, একদম সময় নেই, কাল পরীক্ষা। শাড়ির প্যাকেট করা হলে গেলে ঝড়ের মতো কেড়ে নিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে একটা রিকশায় উঠে বসলাম।
কই যাইবেন স্যার?
মোহাম্মদপুর, আদাবর দুই নাম্বার রোড, তাড়াতাড়ি চল ব্যাটা।
পচিশ টাকা লাগবো স্যার।
আরে ডাকাত নাকি! পনেরো টাকার ভাড়া পচিশ টাকা চাস।
রিকশাচালক কিছু বলতে চাইলো। কিন্তু আমার চোখ ততোক্ষণে স্থির হয়ে গেছে শীলাআপুর দিকে। শীলাআপু আমার এক বছরের সিনিয়র। আমাদের আগের ধানমন্ডির বাসার পাশের বাসাতেই তারা থাকতো। শুনেছি এ বছর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ-তে ভর্তি হয়েছেন। পরিচয় থাকলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই।
আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটিকে হালকা হলুদ সালোয়ার কামিজে আজ অনেক সুন্দর লাগছে। কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করার কোনো মানেই হয় না। জাহান্নামে যাক রসায়ন মডেল টেস্ট।
আরে শীলাআপু, এখানে কি করছেন?
সজীব যে, কি খবর। তোমার না কয়েকদিন পরে পরীক্ষা, এই এলাকা কি ছাড়তে ইচ্ছা করে না?
আপনার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্যই হয়তো এখানে নিয়ে এসেছে।
অ্যাই, দুষ্টুমি হচ্ছে! আচ্ছা, দেখো তো কি যন্ত্রণায় পড়লাম। কাল রমনা বটমূলের এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা। তিন বান্ধবী একই রকম শাড়ি কিনবো। আমি এসেছি প্রায় আধা ঘণ্টা হলো, অথচ...।
শীলাআপু আপনি ভালো আছেন? শরীর মন ভালো তো?
হ্যা ভালো। তারপর মুচকি হেসে বললেন, ঘরে বসে থেকে তোমার স্বাস্থ্য তো খুব ভালো বানিয়েছো।
আমার কি দোষ? আপনিও তো...।
হঠাৎ শীলাআপুর মোবাইল ফোন বেজে উঠলো।
আরে শান্ত তুই কোথায়?...কথোপকথন চললো।
শীলাআপু ফোন অফ করলে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি শাড়ি কিনবেন না?
ধেৎ! তারা নাকি শাড়ি কিনে ফেলেছে। এখন একা...। আচ্ছা চলো, তোমাকে নিয়ে, না, সরি তোমার তো আবার পরীক্ষা।
তড়িঘড়ি করে বললাম, আরে না না, পরীক্ষা কোনো সমস্যাই না। বেশি পড়ে মাথা জ্যাম হয়ে গেছে। আজ রেস্ট।
তাই নাকি?
আচ্ছা শীলাআপু, দেখেন তো এ শাড়িটা কেমন? পছন্দ হলে নিতে পারেন।
ওয়াও, খুব সুন্দর তো শাড়িটা। খুলতে হবে না, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এটা কার?
এটা আপনাকেই মানাবে। তাই এটা আপনার।

শাড়িটির দাম দিতে চাইলে আমি বললাম, না, না মাথা খারাপ, সামান্য একটা শাড়ি, টাকা নেবো কেন? ছিঃ! ছিঃ!

তিনি বেশি জোর করলেন না। বললেন, তাহলে চলো।

কোথায়?

আমাদের বাসায়।

কেন?

ওমা! তুমি আমাকে শাড়ি কিনে দিলে। তোমাকে কিছু খাওয়াবো না?

বাসায় নেয়ার আগ্রহটা একটু বেশিই মনে হলো। কারণ এখানেও তো অনেক খাবার দোকান আছে। ততোক্ষণে শীলাআপুর হ্যাচকা টানে ধপ করে গাড়িতে উঠে বসলাম তার পাশে এবং লোভাতুর দৃষ্টিতে খুব কাছ থেকে তার শরীরের সৌন্দর্য দেখলাম। এক ফাকে তাকে বললাম, এই শাড়িটিতে আপনাকে কেমন লাগবে তা দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।

তিনি শুধু মুচকি হাসলেন।

বিশাল বাড়ির ড্রয়িংরুমে আমাকে বসিয়ে রেখে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। বাসায় তেমন কেউ নেই মনে হচ্ছে। মিনিট দশেক পর হঠাৎ শুনলাম, সজীব, শাড়িটি মনে হয় বাচ্চামেয়েদের।

কথাগুলো অস্পষ্ট মনে হলো। কিন্তু আমাকে শীলাআপু কি ডাকছেন? হৃদকম্পনের মাত্রা বেড়ে গেল। বুঝলাম শীলাআপুর বেডরুমের দরজায় এসে দাড়িয়েছি। আমার ঠিক সামনে মাথায় হলুদ তোয়ালে প্যাচানো মাত্র গোসল সেরে ওঠা শীলাআপু যেন তরতাজা একটি গাদা ফুল। তার দুই চোখ যেন আমাকে আরো কাছে ডাকছে। ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। পিষে ফেললাম তাকে আমার বিশাল বুকে। ঠোটে ঠোট রাখতেই কোনো বাধা না পেয়ে আমার হাত দুটো যেন সাহসী হয়ে উঠলো। সরিয়ে ফেললাম প্রায় সব আবরণ তার শরীর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে শীলাআপু বাদ সাধলেন। প্রায় জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, প্লিজ, প্লিজ আজ নয়। তোমার পরীক্ষা শেষ হোক।

আমি যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম। নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিলাম। মনে হলো পরীক্ষার নাক বরাবর একটা ঘুষি মারি।

গাঢ় নীল রঙয়ের ম্যাক্সিতে নিজেকে ঢেকে নিয়ে শীলাআপু বললেন, পরীক্ষার পর এসো, তোমাকে নিরাশ করবো না।

ব্যথিত আমি ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইলাম।

নীল পোশাকে অপরূপা শীলাআপুর সান্নিধ্য এক ঘণ্টা কাটানোর পর বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সঙ্গে রইলো সেই শাড়িটি আর চিন্তা চেতনায় থাকলো পরীক্ষার পরের সম্ভাব্য সুখ।

সেদিন রাতে হলো না লেখাপড়া, হলো না ঘুম। শুধু মনে হলো টাইম মেশিনে করে চলে যাই এক মাস পরের সময়টাতে। শীলাআপুকে দিয়েছিলাম ছোট একটি শাড়ি। একথা ভেবে হাসিও পাচ্ছিল। কিন্তু শীলাআপুদের বাসায় আর যাওয়া হয়নি। কারণ এক মাস পর শীলাআপুদের সিলেটি পরিবার লন্ডনে শিফট হয়ে যায়। এবং আমার পরীক্ষাও খুব খারাপ হয়। ছোটবোনের সেই শাড়িটিকে দেখলে এখনো সেই দিনটির কথা মনে পড়ে। রাগ হয় পরীক্ষা খারাপের জন্য। আফসোস হয় শীলাআপুর জন্য।

খুলনা থেকে

সার্থক

–নীলা চৌধুরী

আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর হলো। আমার স্বামী দেশের বাইরে থাকে। এ পর্যন্ত আমার স্বামীর কাছ থেকে তার পছন্দ করা শাড়ি পেয়েছি অনেক। কিন্তু বিয়ের তিন বছরেও নিজের পছন্দে কোনো শাড়ি কিনিনি। নিজের হাতে টাকা খরচ করে শাড়ি কেনার সাহসও পাইনি। শাড়ি কিনতে গেলেই মনে হতো অযথা শাড়ি কিনে টাকা নষ্ট করে কি লাভ? শাড়ি কিনতে যে টাকা লাগবে সেগুলো দিয়ে রান্নাঘরের টুকিটাকি জিনিস কিনলে অনেক কাজে আসবে। এসব ভেবে আমার কখনো শাড়ি কেনা হয়ে ওঠেনি।

গত রমজানের ঈদে যখন মার্কেটে গেলাম শাড়ি কিনতে তখন অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা শাড়ি খুব পছন্দ হলো। কিন্তু কোনো রকমে কিনতে ইচ্ছা করছে না। আমার মাথায় তখন ঘুরছে সংসারের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেগুলো কিনলে শাড়ির চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগবে। এরপরও নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে শাড়িটা কিনলাম। দাম মাত্র ৮০০ টাকা। শাড়িটা কেনার পর এটা আমার স্বামীর পছন্দ হবে কি না সেটা নিয়ে মনে আবার খুত খুত করতে লাগলো। তার আবার সব কিছু সহজে পছন্দ হয় না।

ঈদের কয়েকদিন পর শাড়িটা পরে ছবি তুলে তার কাছে পাঠালাম। সে তো ছবি দেখে খুব খুশি। শাড়িটাতে নাকি আমাকে বেশ মানিয়েছে। আমাকে নাকি খুব সুন্দর লাগছে সে শাড়িতে।

এরপর টেনশনমুক্ত হলাম। যাক, সে খুশি হলেই আমি খুশি। মনে হলো আমার শাড়ি কেনাটাই বুঝি সার্থক হয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে

ভালোবাসা ডিজাইন

– গিয়াস উদ্দিন লিটন

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে যাযাদি এক দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে বন্ধু রাজুকে নিয়ে যথাসময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠানস্থলে হাজির হই।

অনুষ্ঠানের প্রবেশ মুখে হলুদ গাদা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে আমাদেরকে বরণ করে নেয়া হয়। একই সঙ্গে গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় আকর্ষণীয় লেমিনেটেড পরিচয়পত্র। মাথায় পরিয়ে দেয়া হয় ভালোবাসার লোগো অঙ্কিত সুদৃশ্য কাগজের মুকুট, হাতে দেয়া হয় তথ্য সমৃদ্ধ বুকলেট।

লেডিস ক্লাব অডিটোরিয়াম আকর্ষণীয় ও রুচিশীল সাজে সজ্জিত। জিন আর পরীতে পরিপূর্ণ। মেয়েদের সুন্দর দেখালে পরী বা পরীর মতো বলা হয়। এতে যাকে বলা হয় সেও খুশি হয়। পরীর পুংলিঙ্গ জিন। তবে কোনো পুরুষকে সুন্দর দেখলে জিনের মতো সুন্দর বলতে কখনো শুনিনি। জিন

বললে পুরুষটি খুশি হবে কি না জানি না। তবে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করায় নিজেও অস্বস্তি বোধ করছি।

শফিক রেহমানকে প্রথম দেখলাম। সারা অনুষ্ঠান জুড়ে ওনার সে দৌড়াদৌড়ি, স্মার্টনেস, বাচনভঙ্গি তথা সার্বিক পারফরমেন্স দেখে আমার কাছে ওনাকে তরুণ বলেই মনে হলো।

আমরা চেয়ারে বসার কিছুক্ষণ পর ওই প্রবীণ–তরুণ আমাকে মঞ্চে ডাকলেন। আমার পরিচয়, যাযাদি আমার কি লেখা ছাপা হয়েছে জানতে চাইলেন। আমার বাড়ি ফেনী শুনে তিনি বললেন, এক ব্যক্তির কারণে আপনার জেলা তো সারা দেশে পরিচিত এবং সে ব্যক্তিটির নামও বললেন। আপনাকে আমরা আবার মঞ্চে ডাকবো, আপনাদের ফেনীর গল্প শুনবো।

মঞ্চ থেকে নেমে শফিক রেহমানের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত মি. এমরান–এর সঙ্গে পরিচিত হলাম, তিনি আমাদের ফেনী জেলারই লোক। দুজনে কথা বলতে বলতে অডিটোরিয়ামের পেছনে সারিতে বসলাম। এতোক্ষণ আমার ফ্রেন্ড রাজুর পরিচয় পর্ব চলছিল। সেও এসে আমাদের পাশে বসলো।

হঠাৎ সামনের সারির এক মহিলার ওপর আমার চোখ আটকে গেল। ঠিক মহিলা নয়, মহিলার শাড়ির ওপর। স্বামীসহ এসেছেন। পরে জেনেছি ওনার নাম তাজনাহার নাজমুল মিলি।

শাড়িতে নতুনত্ব আর সৃজনশীলতার ছাপ লক্ষ্য করলাম। শাড়িটা যে বৈচিত্রময় এবং আনকমন এ কথা রাজুকে বললাম। বার বারই বললাম। আরো বললাম, দোস্ত মহিলাটার একটা ছবি উঠিয়ে নে। এ রকম একটা শাড়ি পপিকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে বানিয়ে দেবো। আমার শিশুসুলভ বাড়াবাড়িতে রাজু কিছুটা বিরক্ত বোধ করলো। তবে শাড়িটা যে সুন্দর এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত করলো না।

অফ হোয়াইট রাজশাহী সিল্কের ওপর হাতের এমব্রয়ডারি করা শাড়ি। এমব্রয়ডারিতে বহু রঙ খুব রুচিশীলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এবং এমব্রয়ডারির ডিজাইনগুলো ভালোবাসা সম্পর্কিত। খুব সম্ভবত বাংলাদেশে ভালোবাসা ডিজাইনের প্রথম শাড়ি ছিল একটিই।

পরিচয় পর্বের এক পর্বে ওই বৈচিত্রপূর্ণ শাড়ি পরিহিতার ডাক পড়লো। পরিচয় শেষে তিনি মঞ্চ থেকে নামতেই শাড়িটার ওপর চোখ পড়লো মঞ্চে উপবিষ্ট শবনম মুশতারি আর ডেমক্রেসিওয়াচের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর তালেয়া রেহমানের। তালেয়া রেহমান দাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে শফিক রেহমানকে বললেন, আরে দেখো, দেখো ও কি সুন্দর শাড়ি পরেছে।

মিলিকে আবার মঞ্চে ডাকা হলো। সবাই শাড়িটা ধরে ধরে দেখলো। শাড়িটার ডিজাইনার শাড়ি পরিহিতা নিজেই জেনে সবাই ভূয়সী প্রশংসা করলেন। শফিক রেহমান ঝাড়া পাচ মিনিট এ ব্যাপারে বক্তৃতা দিলেন, এ ধরনের প্রতিভার বিদেশে কিভাবে মূল্যায়ন করা হতো ইত্যাদি।

শাড়িটা যে সুন্দর এ কথাটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি এই ভেবে আমার খুব ভালো লাগছিল। বন্ধু রাজু তো পারলে আমাকে মাথায় তোলে। দোস্ত, তুই একটা জিনিয়াস।

অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দেখলাম বৈচিত্রময় আর সৃজনশীল শাড়ি পরার জন্য তাজনাহার নাজমুল মিলিকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

বাড়িতে আসার সপ্তাহখানেক পরেই ওই রকম একটা শাড়ি পপিকে বানিয়ে দিয়েছি। শাড়িটা পরে কোথাও গেলে এ রকম কখনো ঘটেনি যে, অন্তত দুই চারজন শাড়িটি ধরে দেখিনি। পপি এ রকম আরো একটা শাড়ি তৈরি করছে গ্রামীণ ফোনে কর্মরত তার অতিপ্রিয় শান্তা আন্টিকে দেয়ার জন্য। ধন্যবাদ মিলি ম্যাডাম।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

ঝগড়া

– আহমেদ ছায়েম

এমন কোনো বাঙালি ললনা নেই যে জীবনে একবার শাড়ি পরেনি। অন্তত পক্ষে বিয়ে উপলক্ষে তাকে একবার শাড়ি পরতে হয়েছে। আর বিয়ের সঙ্গে শাড়ির তো একটা সম্পর্ক আছেই। বরপক্ষ বিয়ে উপলক্ষে মেয়েকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস কিনে দেয় আর তার সঙ্গে একটি ভালো মানের শাড়ি দেয়া হয় যা পরে শ্বশুরবাড়ি আসতে হয়।

এই বিয়ের শাড়ি উপলক্ষে গ্রামে কনেপক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের কথা হয়ে থাকে বলে আমার বিশ্বাস। আর এই বিয়ের শাড়ি নিয়ে বর–কনে পক্ষের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয় বা হয়ে থাকে তার নমুনা অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। এ নিয়ে যে কবিতার লাইনও সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জসীমউদ্দিন তার *নক্সী কাঁথার মাঠ* কাব্যে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন –

কনের চাচার মন উঠে না খাটো হয়েছে শাড়ি।
সাজুর চাচা দিল তখন ইংরেজি বোল ছাড়ি॥
কিরে বেটা বকিস নাকি কনের চাচা হাকে।
জালি কলা পাতার মতো গা কাপে তার রাগে॥

বিয়ের শাড়ি নিয়ে ঝগড়া–ফ্যাসাদ, কথা কাটাকাটি যে হয়ে থাকে এখন এ রকম একটি ঘটনার কথা বলছি।

দিন কয়েক পরেই আমার চাচাতো ভাইয়ের বিয়ে। তাই বিয়ের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে কনের জন্য অন্যান্য সওদার সঙ্গে একটি ভালো মানের শাড়ি কিনতে হবে। এ দায়িত্বটা দেয়া হলো আমাকে এবং আমার এক দুলাভাইকে। নিকটবর্তী জেলা শহর থেকে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি ভালো মানের শাড়ি কেনা হলো। শাড়িটির দাম বর্তমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দাম শুনলে প্রায় সবারই পছন্দ হওয়ার কথা। কালারটাও অপছন্দ হওয়ার কথা নয়। বিয়ের দিন–ক্ষণ ঘনিয়ে এলো। নির্দিষ্ট দিনক্ষণে আমরা কনে বাড়িতে উপস্থিত হলাম। আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে বসতে দেয়া হলো।

বসার পর কনে পক্ষের কয়েকজন এসে বললো, কনে সাজানোর জিনিসপত্রগুলো দিয়ে দিন।

আমরা তখন চার্ট অনুযায়ী তাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিলাম।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলো। বরসহ কয়েকজন বসে আছি। এমন সময় একজন লোক এসে বললো, কি সব জিনিসপত্র এনেছেন? আর এটা একটা শাড়ি হলো? মাটি কাটা মেয়েদের তো এর চেয়ে ভালো শাড়ি দিয়ে বিয়ে হয়।

আমাদের পক্ষ থেকে একজন বললো, আমাদের যতোটুকু সাধ্য আছে তার চেয়ে ভালো জিনিস কেনার চেষ্টা করেছি। আপনাদের যদি পছন্দ না হয় তাহলে আর কি করা।

ইতিমধ্যে বেশ লোক জমে গেল। কনেপক্ষের লোকটি বললো, এ শাড়ি দিয়ে আমরা আমাদের মেয়েকে দিতে পারি না।

এই কথা শুনে আমাদের পক্ষের লোকজনও একটু উত্তেজিত কথা বললো। কথা কাটাকাটি করতে করতে এক সময় দেখা গেল ছন্দহীনভাবে একজনের হাত অন্যজনের দিকে এলোপাথাড়িভাবে চলছে। এক পর্যায়ে লাঠিও দেখতে পেলাম। বড় ধরনের একটি গোলমাল সৃষ্টি হলো।

এক পর্যায়ে ঝগড়া থেমে গেল। বরসহ আমরা বিয়ে বাড়ি ত্যাগ করলাম। স্থির হলো আর এ বিয়ে হবে না। সে যাত্রায় যে রেহাই পাইনি তা টের পেলাম বাড়িতে এসে যখন শরীরে ব্যথা অনুভব করলাম।

অবশ্য পরে বিয়ে হয়েছে। তবে অনেক খড়কাঠি পোড়াতে হয়েছে এবং বেশ কিছুদিন পরে। এ নিয়ে হয়েছে অনেক দরবার। কনেপক্ষ তাদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে। পরে জানতে পারলাম, যে লোকটি আমাদের সঙ্গে উদ্ভট কথাবার্তা বলেছিল সে ছিল কনেপক্ষের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। যদিও বিয়ে এখনো করিনি। তবে করতে হবে। কিন্তু সেদিনের সে কথা মনে পড়লে এখনো শিহরিত হই, মনের মধ্যে শঙ্কা জাগে।

টাঙ্গাইল থেকে

নাটক

– মোহাম্মদ মোশাররফ হুসাইন মিন্টু

১৯৮৬ সাল। এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে বসে আছি। হাতে অফুরন্ত অবসর। বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম *আধুনিক* ক্লাবের পক্ষ থেকে নাটক মঞ্চায়ন করবো। নাটকে অভিনয় করার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। এবার বোধহয় আশা পূর্ণ হবে।

সে সময় আমাদের শহরে একজন খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় মিল্টনভাই। পুরো নাম মাহাফুজর রহমান মিল্টন। তাকে সবাই মিলে ধরলাম নাটক নির্দেশনার দায়িত্ব নিতে। আমাদের অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। নাটকের বই বাছাই করে সিদ্ধান্ত হলো শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত *বৌদির বিয়ে* নাটক মঞ্চায়ন করবো। শুরু হলো চরিত্র বাছাই। আমি পেলাম রাম ঘটকের চরিত্র। প্রায় দেড় মাস মহড়া চালানোর পর মিল্টনভাই জানালেন, নাটক এখন একটা মোটামুটি পজিশনে দাড়িয়ে গেছে আমারা আগামী সপ্তাহে নাটক মঞ্চস্থ করবো। শুরু হলো চাদা আদায়, ব্যানার টাঙানো, পোস্টার লাগানো, মাইকিং ইত্যাদি প্রচারণা। গ্রাম থেকে বাশ কেটে এনে চৌকি দিয়ে মঞ্চ তৈরি হলো।

নাটক মঞ্চায়নের আগের রাতে স্টেজ রিহার্সালের পর মিল্টনভাই খাতা কলম নিয়ে এলেন। সবার নামের পাশে কি পোশাক–আশাক লাগবে তা লিখে হাতে একটি করে স্লিপ ধরিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে তেমন কিছুই নেই। শুধু একটি শাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, চশমা এবং একটি ছাতা। মিল্টনভাই নির্দেশ

দিলেন এসব প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আগামীকাল বিকাল চারটার মধ্যে ক্লাবে এসে সবাই হাজির হবে। পাচটা থেকে মেকআপ শুরু হবে। সন্ধ্যা সাতটায় নাটক। এর যেন অন্যথা না হয়।

আমার ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। কাল রাতে নাটক হবে। শ শ দর্শক লাল–নীল আলোর ঝলকানিতে আমাদের দেখবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম সকাল হলেই (..... দাদার) কাছ থেকে ধূতি নিয়ে আসবো। কিন্তু প্রথমেই হোচট খেলাম। দাদা যা বললেন তার সারাংশ হলো এই আধুনিক যুগে কি কেউ ধুতি পরে? অগ্যতা কি করা। ডু ট্রাই এগেইন। আমাদেরই আর একজন প্রতিবেশী। সঙ্গত কারণে নাম উল্লেখ করছি না। বেশ কমাস আগে তিনি বিয়ে করেছেন। ধরলাম তাকে, দাদা ধুতি দিতে হবে। নাটক করবো। চোখ কপালে তুলে দাদা বললেন, না না বিয়ের ধুতি এটা আমার সারা জীবনের স্মৃতি। তাছাড়া বিয়ের ধুতি কাউকে দিলে অমঙ্গল হয়। বুঝলাম এখানেও ডাল গললো না। বুঝতে পারি না, এক রাতের জন্য ধুতি দেয়ার সঙ্গে অমঙ্গলের কি সম্পর্ক আছে। হাটতে হাটতে ভাবছি, কি করা যায়, হ্যা পেয়েছি। পদো আমার ছোটবেলার বন্ধু। যাক এবার ধুতি পাবোই। সাইকেল নিয়ে ছুটলাম পদোর বাড়ি। পেয়েও গেলাম পদোকে। সমস্যার কথা বলতেই বললো। ধুতি আছে। কিন্তু বুড়িমা (দাদি) দেয় কি না এটাই আসল কথা। আমি ঘরের বাইরে দাড়িয়ে আছি। পদো পূজার ঘরে গেল, ফিরে এলো মুখ কালো করে। বললো, বুড়িমার একটাই ধুতি এটা পরে তিনি পূজা করেন। মন খারাপ করিস না। তোকে ধুতি দিতে পারলে আমার নিজেরই ভালো লাগতো।

হতাশায় ডুবে গেলাম। তবে কি ধুতি পাবো না? বিকাল চারটায় যখন একে একে সবাই হাজির হচ্ছে ক্লাব ঘরে, আর মিল্টনভাই বুঝে নিচ্ছেন তাদের প্রপসগুলো। আমি জানালাম, আমার ধুতি যোগাড় হয়নি। কথা শোনামাত্রই মিল্টনভাই গলা শক্ত করে উঠলেন, ফাজিল কোথাকার। একটা ধুতি যোগাড় করার মুরোদ নেই, এসেছো নাটক করতে। বের হয়ে যাও এখান থেকে।

এতোগুলো ছেলেমেয়ের সামনে এভাবে বকা খেয়ে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমার এই অবস্থা দেখে বন্ধু কলিম কানে কানে এসে বললো আরে, শাদা শাড়ি হলেও তো হয়। তুই ব্যাটা বুদ্ধ, যা শাড়ি নিয়ে আয়। তোর দাদির শাড়ি আছে না।

বললাম, আছে।

যা নিয়ে আয়।

অবশেষে দাদির শাড়িকে ধুতি বানিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করলাম। দর্শকদের বাহবা, প্রশংসা আর করতালিতে ধন্য হলাম। তারপর অনেক নাটকে অভিনয় করেছি। কিন্তু ধুতি যোগাড় সংক্রান্ত বিড়ম্বনা কথা ভেবে ধুতি পরে অভিনয় করা চরিত্র ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে গেছি প্রতিনিয়ত।

প্রতিভাপাড়া, নীলফামারী থেকে